BHAVNACHINTA
by Maitrayee Devi

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৬০

Published by—
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3, College Street Market.
Calcutta-7 (1st floor) INDIA

প্রতিষ্ঠাতা :
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা :
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রাকর :
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ চিত্র :
অমিয় ভট্টাচার্য

ভাবনাচিন্তা

সূচীপত্র

॥ সাহিত্যের ভাষা ॥

আজকের আমাদের আলোচ্য বিষয় 'সাহিত্যের ভাষা'। বিশেষ ভাবে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ভাষা সম্বন্ধে কিছু সচেতন মননা চাই। ভাষাই সেই আশ্চর্য সম্পদ বা গুণ যার দ্বারা মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীর চেয়ে পৃথক হয়েছে। মানুষের যে অংশ জীব সাধারণের সঙ্গে এক, সেই জৈব অংশকে ছাড়িয়ে বহুদিকে বহু বিস্তৃত তার দৈব সত্তা। সে সত্তার প্রকাশ ঘটেছে ভাষার মাধ্যমে। জড় প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত এই প্রাণ প্রথমে ছিল বোবা, তারপর জন্তুর মধ্যে শুনি তার অব্যক্ত ক্রন্দন, তার আত্মপ্রকাশের কত নিষ্ফল আর্তনাদ ন্তের মানুষের মধ্যেই যা পেল প্রথম প্রকাশের পথ অর্থযুক্ত বাক্যের মাধ্যমে। ত ক্রমিক থেকে জীবের প্রথমে উন্নতি তার চলা ফেরার শক্তিতে। গতির সম্পদে ভেদ বিপুল মধ্যে ভাষা দিয়েছে তার মনকে গতি। শরীরের চলাকে অতিক্রম করে লত বিবর্তন সুরু হল তার ভ্রমণ। ণ্ডের ভাবের

ভাষার গতি বলতে এই বোঝায় একজন থেকে অন্য আর একটি মনে দেশজ ভাষায় করবার ক্ষমতা। যখনই কথা বলি তখনই চাই অন্য মনের মধ্যে নিজ নেই বিভিন্ন চিন্তাকে প্রবেশ করাতে। মানুষ যদি একলা হত তবে সে কথা বলত কি য়া মানুষের অন্য মানুষের মনের সঙ্গে এই যে যোগ স্থাপনের ইচ্ছা এ শুধু নলেও তার প্রয়োজনের খাতিরেই নয়—শুধু একত্র বসবাস, দেওয়া নেওয়া ও গোষ্ঠী পরিচয়ের বন্ধনেই সমাপ্ত হয়নি কোনোদিন। তই গাঁথা

মানুষ তার জন্মকাল থেকেই ভাষাকে একই সঙ্গে তার জীবন ধারণের প্রঃ। এ প্রত্যহের ব্যবহারে লাগিয়েছে এবং আরও কিছু বলতে চেয়েছে যা তখন তার নিজের, কাছেও স্পষ্ট নয়। পাহাড়ের গহ্বরে, পাথরে, পোড়ামাটিতে সে কত কথা লিখে রেখেছে যা আজ বোঝবার সাধ্য নেই। তবু সেই অজ্ঞাত রচনার রেখায় রেখায় এই কথাটি স্পষ্ট যে বহু পূর্বে যুগের মানুষের মন আজকের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল।

শিক্ষা এবং সাহিত্য এই দুই পথে মনের চিত্ত চিরদিন ধরে ক্রমাগত মানবের মনের দিকে বয়ে চলেছে। নিজে যা বুঝেছে নিজে যা ভেবেছে যে অনুভাবে যে সুখে দুঃখে স্পর্শিত হয়েছে সে শুধু নিজের করে রেখে মানুষের সন্তোষ নেই এবং পাশের বাড়ির আত্মীয়-কুটুম্বকে জানিয়েও সন্তোষ নেই, বহু যুগ পার করে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের মধ্যেও সেই ভাবনাকে চালিয়ে দেবার এক অসীম আগ্রহে মানুষের ভাষা সাহিত্যের রূপ নিয়েছে। এইতো গেল গোড়ার কথা। এরপরে স্বতই মনে হয় সাহিত্যের ভাষা এক পৃথক পোষাকী বস্তু কিনা, যে ভাষা প্রতিদিনের প্রয়োজনে লেনা-দেনার টানা পোড়েনের মধ্যে তৈরী হচ্ছে, ঘষে যাচ্ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে বেঁকে যাচ্ছে সেই আটপৌরে ভাষা কি সাহিত্যে অচল ?

আমরা জানি ভাষা সবদেশে ও সবকালে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল বিশেষত যখন দেশে দেশে দূরত্ব বিজ্ঞানের প্রভাবে এমন করে মুছে যায়নি। যখন দু ক্রোশ দূরের লোকের সঙ্গে দিনে একবার দেখা হওয়া সম্ভব ছিল না, তখন ভাষার এই পরিবর্তন আরো বিশেষ লক্ষ্য গোচর ছিল। এবং একই দেশের উত্তর-দক্ষিণে উচ্চারণ বর্ণ-বিন্যাস ও শব্দের অর্থেরও পার্থক্য ঘটত অতি সহজে। উত্তর থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব থেকে পশ্চিমের কথ্য বাংলা ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এর তাৎপর্য বোঝা যায়। নদিয়া জেলার ঘরোয়া কথাবার্তার সঙ্গে চট্টগ্রামের ভাষার পার্থক্য প্রায় অসমীয়া ও নেপালীর সঙ্গে দক্ষিণ বাঙ্গলার মতই। তবু চলিতভাষার এই বিপুল পার্থক্য সত্ত্বেও সাহিত্যের একটি শুধু ভাষার আদর্শ নিশ্চয় আছে— যার প্রভাবেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব। একথা অবশ্য অন্যান্য সকল দেশেই সত্য। প্রতিদিনের কথাবার্তার ঘষা লেগে, বিভিন্ন মানুষের মুখে মুখে একই ভাষা ক্রমে ভা- বদলে একেবারে অন্য হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তন সাহিত্যের স্থায়ীত্বের বাংলা ন্থী। সাহিত্য রচনা কেবলই সাহিত্যিকের অন্তরের তাগিদের স্বতঃস্ফূর্ত সমাজ সে কবি কবিতা লিখেই সন্তুষ্ট একথা পুরোপুরি সত্য নয়। সাহিত্য তার প্রতীক্ষা পায় পাঠকের মন থেকে। পাঠকের ও লেখকের সম্মেলনেই সাহিত্যের লালফিতা কের ক্ষেত্র দেশে কালে যত ব্যাপ্ত সাহিত্যেরও তত প্রসার। বস্তুত বিবেকানন্দ ও দক। একটি তার আশু প্রয়োজনের ক্ষণিক কাজে ফুরিয়ে যায় কবির সাধ চন্তে চিরদিনের স্থান খোঁজে। সে অমরত্বের প্রয়াসী। সেই স্থায়ীত্বের বিচার অবিরত পরিবর্তন ক্ষতিকর। তা ছাড়া ব্যাপকতার জন্যও নির্দিষ্ট সঙ্গীত ও প তিগুলি ত্যাগ করা প্রয়োজন। চট্টগ্রামের প্রচলিত কথ্য ভাষার রচনার পূজা অন্যান্য প্রান্তের বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্যই প্রাত্যহিক ২রা অক্টো দ্বারা যে প্রাদেশিকতা গড়ে ওঠে সেগুলি বর্জন করে ভাষার একটি শুদ্ধ ধর্ম রক্ষা াকা প্রয়োজন। কিছুদিন পূর্বে যখন শিক্ষিত লেখকের সংখ্যা অনেক বাউল লে এবং শুদ্ধ ভাষা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকেদের গণ্ডীর মধ্যে কেবল রচনার তই বন্ধ ছিল। তখন কথ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার পার্থক্য ছিল বিরাট। ক্রমে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সাহিত্য মানুষের জীবনে প্রবেশ করে তার প্রতিদিনের ভাষাকেও দিয়েছে বদলে। এবং যে ভাষার শিক্ষার চর্চা যত ব্যাপক সেই ভাষায় কথ্য ও রচনার ভাষার পার্থক্য কমে এসেছে। আমরা জানি ভাষা চিন্তার বাহন। চিন্তাকে প্রকাশ করবার তাগিদেই ভাষার জন্ম, আবার ভাষাও চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তাতে সন্দেহ নেই। যে ভাষায় যত চিন্তাশীল মানুষ জন্মেছেন সেই ভাষা ক্রমে ততই পরিণতি লাভ করেছে, নানা ঐশ্বর্যে পূর্ণ হয়েছে।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের ভাষা সংস্কৃতের কোলে জন্ম। সমৃদ্ধ সংস্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা এক সময়ে নানা গূঢ় গভীর চিন্তার বাহন ও ধারক হয়েছিল। তার সঙ্গে প্রতিদিনের কথ্য ভাষার ঘটল ক্রমে ক্রমে বিচ্ছেদ। কারণ শুদ্ধতা রক্ষার খাতিরে এই ঐশ্বর্যময়ী নিজের চারিদিকে ব্যাকরণ ও নিয়মের কঠিন প্রাচীর গাঁথলেন, পাছে তার এতটুকু ত্রুটি বিচ্যুতি হয় তাই মূঢ়জনের প্রাকৃত জনের মুখে তা হল নিষিদ্ধ। ভাষা দেবতা হয়ে উঠল পাছে প্রত্যহের ব্যবহারের মলিনতা তাকে নষ্ট করে তাই সাধারণের অগম্য ব্যাকরণের দুর্ভেদ্য দুর্গে বন্ধ সেই বিশুদ্ধ

ভাষা পরম জ্ঞানের পাত্রটি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জীবনের চলাচলের পথ থেকে দূরে। ফলে সে যত্নে রইল বটে কিন্তু যেমন অতি যত্নে একটি সজীব চারাকে সিন্দুকে বন্ধ করে রাখলে তাকে নিরাপদ করা হয় বটে, ঝড়-ঝাপটায় নষ্ট হয় না, গরু ছাগলে খায় না, কিন্তু সজীব গাছ মরে শুকনো কাঠ হয়ে যায়। তেমনি এই প্রাণদায়িনী মহা ঐশ্বর্যবতী শাশ্বত জীবনের বেগে হারিয়ে মরে গেল।

ভাষার প্রবাহ প্রাণের প্রবাহেরই মত। জীবন থেকে তার রস আহরণ করা চাই। মানুষের জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে তাঁকে বাঁচান যায় না। সেই কারণেই প্রাণ-প্রবাহের মত ভাষারও চলাচল চাই। তার জন্ম ও মৃত্যু আছে। মানুষের জীবন থেকে সরে গিয়ে সংস্কৃত মরে গেল, জন্ম নিল প্রাকৃত ভাষা—মাতৃদেহ থেকে রসে পুষ্ট হয়ে সেই প্রাকৃত নানা প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিদিনের ব্যবহারে মানুষের নানা অনুভাবের প্রকাশে তার চির পরিবর্তনশীল বেগবান মনের স্পর্শে ভাষা নূতন নূতন কলেবর ধারণ করে। ভিতরের মূল প্রবাহগুলি থাকলেও তার বাইরের আকৃতি যায় বদলে। এই বদলের দুই প্রান্তের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেই পার্থক্য প্রচণ্ড কিন্তু সেই পরিবর্তন এত ক্রমিক যে অল্পকালের মধ্যে লক্ষ্য হয় না। তাই সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার প্রভেদ বিপুল হলেও বাংলা দেবভাষারই আত্মজা। আবার এই বাংলার ও নানা প্রচলিত বিবর্তন তার শুদ্ধ রূপের থেকে পৃথক। তবু সেই শুদ্ধ বাংলাই একটি ভূখণ্ডের ভাবের বাহন হয়ে বাংলা ভাষার ও বাঙ্গালী মনের বন্ধন হয়ে আছে। দেশজ ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রেরণা নেই তা নয় সমস্ত লোক সাহিত্যের উদ্ভব সেইখানেই বিভিন্ন প্রদেশের দেশজ বিকৃতি সত্ত্বেও মানুষের আদরণীয় শ্রুতিমধুর। ঘরোয়া মানুষের কাছাকাছি। লোক সাহিত্য বিশেষ পরিধির কথ্য ভাষাতেই জন্ম নিলেও তার মধ্যে সাহিত্যের বিশেষ চিহ্নটুকু থাকে সর্বদাই সদা ব্যবহৃত শব্দর অতি পরিচয়ের সাধারণত্বর থেকে সরিয়ে দিয়েছে। ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি কথ্যভাষাতেই গাঁথা কিন্তু মনের বিশেষ ভাবগুলির ছোঁয়া লেগে তা বেঁকেচুরে নূতন হয়েছে। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন—"খোকন যাবে নায়ে, লাল জুতুয়া পায়ে"—জুতো তো সবাই জানে, জুতুয়াটি কি? খোকনের প্রতি যে বিশেষ অনুরাগ ও তারই ভাষা। প্রতিদিনের ব্যবহারে কথার পালিশ উঠে যায় মনের সূক্ষ্ম রসানুভূতি জাগিয়ে তোলবার মত তার দীপ্তি থাকে না। নিত্য ব্যবহৃত রং চটা আসবাবের মত তখন সাহিত্যিক নূতন নূতন কাঁপ খোঁজেন, এক শব্দকে একটু অন্যভাবে ব্যবহার করেন, একটু নূতন ভঙ্গীমা দেন তাতেই ভাষার নবশক্তি নব জীবন লাভ হয়। চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর—অবশ্য এ কথ্য ভাষাই কিন্তু দৈনন্দিন খাওয়া-পরার কথার নয়—যে কথার অব্যক্ত বেদনায় মন মথিত হয়েছে সেই কথার এ ভাষা। এ ভাষায় যে বেদনা ধ্বনিত হয় তা বলা মাত্রই ফুরিয়ে যায় না। যুগ যুগান্ত ধরে তার অনুরণন মানুষের মনে বাজতেই থাকে এবং এইরকম ভঙ্গীর দ্বারাই প্রাদেশিক অশুদ্ধ কথ্য ভাষার মধ্যেও অমর বেদনার স্পন্দন বিদ্ধত হয়। আবার শুদ্ধ ভাষা যার নিয়ম নির্দিষ্ট ছাঁচ সমস্ত দেশজ ভঙ্গীকে অগ্রাহ্য করে একটি মান রক্ষা করে। ব্যবহারিক ভাষার চেয়ে শব্দ সম্ভারে সমৃদ্ধ হলেও সেই শুদ্ধ লেখ্য ভাষারও প্রকাশ ক্ষমতা ব্যবহারের দ্বারা

ম্লান হয়ে আসে। এক একটি শব্দ পুরানো হয়ে যায়, তখন ভাব প্রকাশের বা পাঠকের চিত্তে ভাব উদ্বোধনের শক্তি বা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। সেইজন্যই প্রতি যুগে নূতন লেখকের হাতে ভাষা কেবল নব নব ভঙ্গীতে মনোহারিণী হতে চেষ্টা করে। শব্দের একটু হেরফেরে বিশেষ্য বিশেষণের একটু ওলট-পালটে পদবিন্যাসের সামান্য একটু পরিবর্তনেই অসাধ্য সাধন হয়। সামান্য কথা অসামান্য রূপ নেয়।

যেমন,

"সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল
স্বপ্ন জড়িমা পলকে ভাগিল
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।"

রূঢ় কথাটা কার বিশেষণ? দীপ না আলো? রূঢ় কথাটি মানুষের চরিত্র সম্বন্ধেই সাধারণ বাংলায় ব্যবহার হয়ে থাকে। আলোকে তীব্র উজ্জ্বল দীপ্ত ইত্যাদি বিশেষণেই বিশেষিত করা হয়। কিন্তু রূঢ় এই নূতন বিশেষণের প্রয়োগে ভাষার একটি বিশেষ ভঙ্গীতে অর্থের এক নূতন ব্যঞ্জনা আছে। সদ্য জাগ্রত চোখের উপর দীপ্ত আলো যে কর্কশতা যে কষ্ট আনে, রূঢ় কথার মধ্যে সেই অর্থটি প্রতিভাত, রূঢ় আলোক পড়ল কোথায় ক্ষমা সুন্দর চক্ষে—আজকাল ক্ষমাসুন্দর কথাটির খুব ব্যবহার হয়েছে। 'অভিসার' কবিতায় যখন প্রথম এই সমাসবদ্ধ পদটি পাওয়া গেল তখন বাংলায় এটি একটি সম্পূর্ণ নূতন প্রয়োগের বিষয় নিয়ে এসেছিল। চক্ষু যে ক্ষমার দ্বারা সুন্দর হয়—এত সংক্ষেপে তার এমন নিখুঁত প্রয়োগ একটি নূতন উপলব্ধির সৃষ্টি করে এবং প্রত্যহ ব্যবহারের শব্দগুলিই যেন নূতন সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। সর্বদা ব্যবহারে নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে বধ্ধ হয়ে কথা যখন অর্থের ব্যাপ্তি হারিয়ে ফেলে তখন প্রয়োগ ও নূতন ভঙ্গী দ্বারা তাকে নবজীবন দান করা সাহিত্যের একটি কাজ। মানুষের যত অস্ফুট চিন্তা, যত উপলব্ধ অনুপলব্ধ সাধ, যত আনন্দ বেদনার ছোট ছোট কম্পন কথা দিয়ে তার অনুরূপ প্রতিচ্ছবিটি ফুটিয়ে তোলা সাধ্য কিনা সন্দেহ। কারণ কথা সীমাবদ্ধ, অর্থের বন্ধনে বাঁধা মন তা নয়। গাছ মানে গাছই। সাংসারিক প্রয়োজনের জন্য বস্তুর প্রতীকরূপে ওই সাধারণ নামটি যথেষ্ট কিন্তু যখন আলো ঝলমল পাতার নাচে ঘেরা বনস্পতিটি দেখি তখন তার আনন্দ ভাবনা সদা সর্বদার কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তখন কবি তার ভাষায় ছন্দ লাগান, ঘুর লাগান তখন অশ্বত্থ পল্লবে অশান্ত হিল্লোলে সমীর চঞ্চল দিগঙ্গনে—কবির গভীর দৃষ্টির সামনে বিশ্ব সৌন্দর্য যে রূপ উদ্ঘাটিত করে তাকে আটপৌরে কথার মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা যায় না। নূতন বিশেষণ উপমা ও ধ্বনি সংযোগে কবি তার চিত্ত ভাবনার অনুরূপ একটি ধ্বনি তোলবার চেষ্টা করেন।

আকাশে ঝড়ের গর্জন ও বিদ্যুৎ বেগ ভাষায় তার স্পর্শ রাখে। তখন :—

গগনে গগনে ধায় হাঁকি
বিদ্যুৎবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী
ছন্দ ছুটিল হোম বহ্নির তরঙ্গে
মুক্তি রণের যোদ্ধৃবীরের ভ্রূভঙ্গে—

ছন্দ ঝঙ্কারের ধ্বনি সংযোগে কবি ভাষার মধ্যে ভাষাতীত ভাবকে ধ্বনিত

করতে চান। কথ্য ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার পার্থক্য প্রধানত এই যে সাহিত্যে মানুষ যে সমস্ত ভাব প্রকাশ করতে চায় তা প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনের মধ্যে বন্ধ নয় তার ক্ষেত্র পৃথক। সেই গুণে আনন্দ ও উপলব্ধির ছোট বড় নানা সংবাদ তার আপন তাগিদে ভাষাকে নূতন নূতন ভঙ্গী দেয়। একথা লোক সাহিত্য ও সকল রকমের কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য। মানুষের যে অনির্বচনীয় ভাবনাকে বচনে ধরে রাখতে চাই অর্থের সীমা দিয়ে ঘেরা শব্দের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কি করে সে ভাবনার অনুভবের অসীমতাকে পাঠকের চিত্তে স্পন্দিত করতে পারে সাহিত্যের ভাষায় তারি নিত্য নূতন পরীক্ষা চলেছে। শব্দের সঙ্গে সুর যোগ করেও সে সেই চেষ্টাই করে।

ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ও রবীন্দ্রবাণী

আজ যখন দুই দেশের সীমানায় সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে সেই দুই দেশ যার মধ্যে রাখী বন্ধনের চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—হিন্দু-মুসলমানের হাতে রাখী বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে পথে পথে ঘুরেছিলেন রাজনীতির কূট খেলার মধ্যে মানবতার বিষয় ঘোষণা করেছিলেন কবি। সেদিনের কথা মনে হচ্ছে। তাঁদের প্রাণের একান্ত ইচ্ছা দেশ জুড়ে যে শক্তি জাগিয়েছিল তাতে "সেটলড ফ্যাক্ট" আন সেটলড হয়ে গিয়েছিল—ভাঙ্গা দেশ জোড়া লেগেছিল। কিন্তু তারপরও সেই কাটা দাগটা মেলাতে পারল না, পদের লোভ, ক্ষমতার লোভ দেশের মধ্যে আত্ম-দ্বন্দ্ব জাগিয়েই তুলল।

হিন্দু-মুসলমান দুজনে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে পরস্পরকে বলতে লাগল "তোমাকে চাই।" শেষ পর্যন্ত হার হলো রবীন্দ্রনাথের। এই হারের সূচনা তিনি দেখেই গিয়েছিলেন, বহু দুঃখে লিখেছিলেন—

…"দেখতে দেখতে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠল। এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্ছে তা রক্ত পংকিল। লখনৌ-এ একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ করে বলেছিলেন কী করা যায়? আমি বললুম, রাষ্ট্রীয় বক্তৃতা-মঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে। …তিনি বললেন, আগা খাঁ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্ছেন। পাছে গান্ধীজীর অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আপনি মিল ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার অভিপ্রায়ে এই দৌত্য। বর্তমান ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক করে দিলে—মিলন হবে কোন্ শুভ বুদ্ধিতে আপীল করে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্ত শাসন হবে ফুটো কলসীতে জল ভরা।"

কিন্তু রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা তখন কলসীকে দুভাগ করেই জল আনবেন ঠিক করেছেন—এসব কথা তাদের স্পর্শ করেনি। মোহম্মদ আলি জিন্নার প্রবর্তিত দ্বিজাতিতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ কোনমতে স্বীকার করেননি—আশ্চর্য এই যে যদিও তখন

'হিন্দু' রাজনীতিবিদরা সকলেই দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে বলছিলেন কিন্তু অন্তরে অনেকেই সেটি স্বীকারও করে নিচ্ছিলেন। অর্থাৎ মনের ভিতর বিদ্বেষভাব থাকায় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব শুধু মুসলমানের নয় হিন্দু সমাজের উপরও পড়েছিল। বহু হিন্দু 'বাঙালী' বলতে আজও হিন্দু মনে করেন। মুসলমানও 'বাঙালী' সেকথা অনেকে ভুলে যান। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব যদি হিন্দু সমাজের অধিকাংশের উপর না পড়ত তা হলে কেবল এক পক্ষের ইচ্ছায় এ তত্ত্বের পরিণাম রূপে দেশ ভাগ ঘটতো না। এক পক্ষের উত্তেজনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না, যদি না অপর পক্ষের উত্তেজনায় তা নূতন নূতন ইন্ধন পায়।

মুসলিম লীগের নীতি হিন্দু মহাসভার উদ্ভবের দ্বারা নষ্ট হয়নি বরং বেড়েই গেল ও দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের তরঙ্গকে একটা চূড়ান্ত পরিণামের দিকে নিয়ে গেল। এই দিকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'সকলের চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি এই যে হিন্দুরা পাছে সমস্ত মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে···কোন জাতি বা এক তিল মাত্র যখন অপরাধ করে তখন সেই জাতির মর্মে আঘাত করে থাকে তবে তার জন্য তাঁরা যেন সমস্ত হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে বিমুখ না হন। তাঁদের মনে রাখতে হবে, এটা উত্তেজনা, এটা স্বাভাবিক বুদ্ধি নয়, "এবং উত্তেজনার বিরুদ্ধে বা বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ যেন না ওঠে। তাহলে কোন সমাধান নেই। মনে রাখতে হবে আত্মীয়দের শত্রুতা স্থলে জিতলেও মৃত্যু, হারলেও মৃত্যু।" রবীন্দ্রনাথের এই বাণী স্মরণ করবার মত এমন উপযুক্ত সময় আর নেই—যখন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সীমা রেখায় কুচকাওয়াজের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তখন মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, পদ্মাতীরে তাঁর কবিতার লীলা-ভূমি—মুসলমান চাষীর হাতে বোনা সোনার ধানে তাঁর সোনারতরী পূর্ণ—আর আজ সীমারেখার দুই দিকে বাঙালীর মনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরধারা প্রবাহিত। রাজ্য শাসনের ভার যার হাতেই থাকুক—দুই ভৌগোলিক সীমায় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও কর্তৃত্ব ভিন্ন হলেই যে মানুষের মনেও দেয়াল তুলতে হবে এমনই বা কেন? মানুষের মন মিলুক না বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে, ছন্দে সাহিত্যের ভাবে, ব্যঞ্জনায়। গঙ্গা ও পদ্মার ভাব তরঙ্গে যুদ্ধের বাজনা যেন ডুবে যায়, আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে রাখি—"আত্মীয় শত্রুতা স্থলে জিতলেও মৃত্যু হারলেও মৃত্যু।" ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে হার-জিত নেই, সবই গ্লানিময়।

কিছুদিন থেকে এই উপমহাদেশে ভাষা নিয়ে নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি অর্থাৎ কালকেই তার দু রকমের দুটো সংবাদ পাওয়া গেল। একটা খবর পশ্চিম পাকিস্তানে নূতন করে উর্দুভাষীদের পিতৃভূমি ও ঐতিহ্যের প্রতি এক বিস্মৃত মমত্বর প্রকাশ। পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু ভাষীরা যাঁরা নাকি ভেবেছিলেন সমগ্র পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে—একটা স্বাধীন স্বরাজ্য পাবেন যেখানে তাঁদের মাতৃভাষাই সর্বাধিক সমাদৃত। অতএব উর্দু ভাষীরাই সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁরাই হবেন রাজার জাত, এবং এই মনের বাসনা নিয়েই নাকি তাঁরা দেশ ভাগে ইচ্ছুক হয়েছিলেন—কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছেন তাঁদের সে আশা পূর্ণ হচ্ছে না। অন্যান্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাঁরা সংখ্যায় কম বেশি যাই হোক নিজ নিজ দাবী ছাড়তে রাজি নন—এমন কি ধর্ম দিয়ে একটা ভাষার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ এমন ভাবের উদ্রেক করেছিলেন যেন ইসলাম ধর্ম ও উর্দু ভাষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুত ধর্ম ভাবনার প্রকাশ কোনো বিশেষ ভাষার মাধ্যমে হলেও তা কোনো ভাষার বিশেষ সম্পত্তি হতে পারে না। জগৎ জুড়ে নানা দেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। উর্দুর কোনো একক অধিকার নেই। কিন্তু এই অধিকার জাহিরের চেষ্টাটা ভাষার জন্যও নয়, ধর্মের জন্যও নয় এর উদ্দেশ্য অন্য ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তার।

আজ বাংলাদেশের অভিঘাতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী নূতন করে চিন্তা করবার চেষ্টা করছে। উর্দু ভাষীরা দেখছে তাদের অতি প্রিয় মাতৃভাষার সে একচ্ছত্র আধিপত্য আর নেই। একদা ক্ষমতার দম্ভে যা ভুলেছিল আঘাত পেয়ে তা নাকি মনে পড়ল—সে তাদের বিস্মৃত মাতৃক্রোড়। মনে পড়ল তাদের যে তারা কেউ পাকিস্তানি নয়—এমন কি স্বয়ং ভুট্টোও ভারতেরই এক গণ্ডগ্রামের নাম বহন করেন। স্পর্ধায় যা ভুলেছিল পরাজয়ের দুঃখের মধ্যে সেই সত্যকে যে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ দেখতে পাচ্ছে, উর্দু ভাষী করাচীর মুসলমান যে আজ বলছে, কেন আমি আর অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করব—কেনই বা আমি আমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমি, আমার পিতৃভূমির প্রতি অবিরত বিদ্বেষ পোষণ করব। আমার ঐতিহ্য ভারতেরই ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত এই স্বীকারোক্তি বা সত্যদর্শনে কোনো লজ্জা নেই। বরং দুঃখের মূল্যে পাওয়া সত্য মানুষের গৌরব। বস্তুত যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মধ্যেই সমস্ত মঙ্গল অমঙ্গল বিধৃত হয় না। আজ যদি পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মন তার পুঞ্জীভূত বিদ্বেষের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে সহজভাবে প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়—যদি ক্ষমতা লোভীরা পঁচিশ বছর ধরে একটা দেশের জনসাধারণকে যে বিদ্বেষ বিষ জর্জর করে তার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল তার চোখের সামনে সত্যকে ঢেকে রেখেছিল এই পরাজয়ে তা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়, পশ্চিম

পাকিস্তানের মানুষ যদি জাতি ধর্ম বা দেশের জন্যই মানুষের প্রতিবিদ্বিষ্ট হওয়া যে কত ভুল তা আজ বুঝতে পারেন তবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় মনুষ্যত্বের উজ্জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে। পরাজয়ের ভূমিতেই উঠবে মানবতার জয়ের নিশান। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক চিড় খেল ভাষা নিয়ে। কিন্তু ভারতেও ভাষা নিয়ে মত্ততা কম দেখা যাচ্ছে না। ইতিপূর্বে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা নিয়ে কম তাণ্ডব হয় নি, এখন চলেছে আসামে। আসাম থেকে যে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের দল এসেছিলেন তাঁদের কাছে এই মূঢ়তার কিছু বর্ণনা শোনা গেল। আমরা জানি বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কিছু ঈর্ষা আছে। কিন্তু সুখের বিষয় বাংলা ভাষাভাষীরা আজ পর্যন্ত অনেক গর্হিত কর্ম করে থাকলেও অন্তত লাঠিবাজি করে ভাষার উন্নতির চেষ্টা করে নি। যাঁদের অভ্রান্ত চিন্তা নানা পথে নানা দিক থেকে সম্পদ আহরণ করে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁরা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে কিনা বা আপিস-আদালতে কোন ভাষায় লেখা হবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি। ভাষার উন্নতি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে কোন ভাষায় চিঠি লেখা হবে তার উপর নির্ভর করে না এটা তাঁরা জানতেন। মোটামুটি বাঙালীরা এটা আজও বোঝে—হিন্দী বা অন্য কোনো ভাষার মাথায়ই তাই মুগুর মারবার জন্য ব্যস্ত নয়।

কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে কোন ভাষা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরীগুলির পরীক্ষার মাধ্যম হবে তার উপর বৈষয়িক উন্নতি কিছুটা নির্ভর করে বলে এদিকে একটা শঙ্কা অহিন্দী ভাষীদের মনে ছিল ও আছে। বস্তুত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন না উঠলে হয়ত ভাষা সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভাষাভাষী গোষ্ঠীরা এত শঙ্কিত হত না। শঙ্কা ও হীনমন্যতা বোধ এই দুই মিলে এক অদ্ভুত ভাষা-প্রেমিক গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে—যারা মনে করছেন অন্য ভাষাভাষীর মাথায় ডাণ্ডা মারাই নিজ ভাষার উন্নতির উপায়।

আসাম রাজ্যে বহু জাতি উপজাতি মিলে বহু ভাষাভাষী। বস্তুত এই বৈচিত্র্যই একটা সমৃদ্ধি।

কারণ বিভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে এলে কোনো ভাষারই ক্ষতি হয় না বরং বিভিন্ন ভাষার বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যঞ্জনা ও ভাব গৌরব ধীরে ধীরে এলে আর একের মধ্যে লীন হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে। বহুগুণসম্পন্না উর্দু ভাষা তারই প্রমাণ। অসমীয়ারা যদি বাংলা শেখেন বা বাঙালীরা যদি অসমীয়া শেখেন তাতে কারু কোনো বিপদ ঘটবে বলে মনে হয় না একথা কে না জানে, তথাপি যে দাঙ্গাবাজি করা হয় তার কারণ যাঁরা দাঙ্গা করেন তাঁরা ভাষা সম্বন্ধে সামান্যই জানেন। বা নিজ ভাষার উন্নতির জন্য সামান্যই চেষ্টা করেছেন।

আসামীরা নিজ ভাষার উন্নতির জন্য কি করেছেন? তাঁরা কি সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ বা বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যে পূর্ণ বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন? তাঁরা কি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলি আসামী ভাষায় অনুবাদের চেষ্টা করছেন—কতগুলি বিজ্ঞানের দর্শনের ইতিহাসের বই অসমীয়াতে লেখা রয়েছে—সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কত লোক গবেষণা করছেন—আর কত লোকই বা লাঠি হাতে ভাষার উন্নতির চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছেন, এর একটা হিসাব হওয়া দরকার, তাহলেই বোঝা যাবে অসমীয়া ভাষা জননীর সুকৃতিকারী সন্তানেরা কার সেবা করছেন। ভাষা

সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা দুইয়ের চরিত্রই এক। দাঙ্গাবাজেরা ধার্মিকও নন ভাষা প্রেমিকও নন। বীরবল এক জায়গায় লিখেছিলেন—"হিন্দু মুসলমান ভারতমাতার দুটি চোখ কারু কারু ধারণা একটি চোখকে কানা করে দিলে আর একটির তেজ বাড়ে"—ভাষা সম্বন্ধেও কারু কারু মনের ভাব একই। যা হোক সমস্যা তো জটিল হয়েছে—এর সমাধান কি?

সমাধান সকলেই জানেন কিন্তু সে দিকে কেউ পা বাড়াবেন না। রাজকার্যে ইংরেজি ভাষাকে অপ্রতিহত রেখে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য কাজে প্রাদেশিক ভাষার চর্চা অবাধ হোক। সাধারণতঃ দুটি ভাষাই প্রত্যেকে শিখবেন নিজ মাতৃভাষা ও ইংরেজি। ইংরেজ আমাদের কিছু ক্ষতি করে থাকতে পারে কিন্তু ইংরেজি কোনো ক্ষতি করে নি। অনেক জল ঘোলা করেও এটা এখন স্বীকার করবার সময় হয়েছে।

বাংলাদেশে

অনেক দিন পর আবার বাংলাদেশে গেলাম বাংলা একাডেমির নিমন্ত্রণে। আমরা ছোট একটি লেখকের দল, দলপতি অন্নদাশঙ্কর রায়। অন্নদাশঙ্কর দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত ছড়া "তোমরা যে সব বুড়ো লোক ভারত ভেঙ্গে ভাগ কর" মস্ত মস্ত নিবন্ধের চেয়েও সত্যগর্ভ বাণী। তিনি তাই ও দেশে সুপরিচিত ও আদৃত। আমিও কিছুদিন থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে ভাবছিলাম যখন আমার দৃষ্টি পড়েছিল আগেকার পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত বাঙালী কি করে এই সমস্যার সমাধান করছে সেই দিকে। তারা ধর্মীয় বিশেষণ বাদ দিয়ে অন্য একটি সত্যতার বিশেষণ খুঁজে পেয়েছে যে তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তার উপরে বড় সত্য যে তারা বাঙালী। আমরাও যারা ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে চাই আমরা ভাবি আমরা আর যাই হই আমরা যে ভারতীয় সেটাই আমাদের সর্বোত্তম পরিচয় হোক কিন্তু এতে মাঝে মাঝে তাল কাটবার ঝোঁক দেখা দেয় যখনই ভাষার প্রশ্ন এসে পড়ে। সে দিক থেকে বাঙলা দেশের মানুষের অনেক বেশি সুবিধা—ঐ ছোট্ট দেশটিতে ভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকলেও ভাষা সকলেরই বাংলা। এই 'বাংলা ভাষার' বিজয় ঘোষণাই তাই ক্রমে ক্রমে এক রাজনৈতিক ঘোষণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাঙালীর মুক্তি যুদ্ধের আগে। সেজন্য বলতে গেলে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ থেকেই প্রথম রণদুন্দুভি বেজেছিল। আমরা ১৯৭১ সালের প্রায় নয় দশ বছর আগে থেকেই পরিচয় পাচ্ছিলাম বাঙলা দেশের মুসলমানের বাঙালী হবার সাধনার। বাঙলা ভাষার প্রসার ও উন্নতির জন্য বাংলা লোকসাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করছিলেন যাঁরা তাদের অনেকেই যুদ্ধ বিজয়ের মুহূর্তে কৌশলী নিষ্ঠুর ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

সেজন্য খুব সঙ্গতভাবেই বাংলা একাডেমি এবারে একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপনের জন্য একটি সারা বাংলা সম্মেলন ডেকেছিলেন। সাতদিন ব্যাপী সেমিনারের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ এবং ব্যাপক আলোচনা

হয়েছিল। সকলের ঐকান্তিক আগ্রহ জানা গেল সর্বস্তরে বাংলা চালু করা। বস্তুত সেরকম আদেশ পূর্বেই জাহির হয়েছে কিন্তু ক্ষোভ এই যে অদ্যাপি তেমন কার্যকরী হচ্ছে না। এজন্য দেখলাম দোষারোপ হচ্ছে আমলাতন্ত্রের উপরই বেশি এবং সেই সঙ্গে ইংরেজিনবিশদের ইংরেজি প্রীতির উপর। ইংরেজিনবিশরা যে কোনো ছুতোয় ইংরেজি আঁকড়ে থাকছেন। বিদ্যালয়ে বাংলা মাধ্যমে তাঁদের রুচি নেই— এবং সরকারী চিঠিপত্রেও ইংরেজি চলছে বাংলা টাইপরাইটার সত্ত্বেও। হাস্যকর কথা এই যে বাংলায় সব সরকারী কার্য চলবে এ নির্দেশটুকুও আসছে ইংরাজিতে।

দীর্ঘ আলোচনা ছয় সাত দিন ধরে চলল বটে কিন্তু ফল কি হবে বলা শক্ত— যতদিন উর্দু বনাম বাংলার লড়াই চলছিল ততদিন ব্যাপারটা ছিল একেবারে অন্যরকম—কারণ উর্দুর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ সংগ্রহ ছাড়া বাংলা ভাষা ও বাঙালী আর কি সম্পদ আশা করতে পারত—তাছাড়া উর্দু ছিল তখন establishment-এর দ্বারা সুরক্ষিত ও আরোপিত ভাষা স্বভাবতই—বিদ্রোহীরা প্রথম শর নিক্ষেপ করবার লক্ষ্য পেলেন তাকেই। কারণ স্বাধীনতা যুদ্ধ সেই অস্ত্র দিয়েই সুরু হল যাকে বলা হয় mighter tnan the sword.

কিন্তু আজকের যুদ্ধটা তত সহজ নয়, সংঘবদ্ধ হবার সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। ইংরেজি বনাম বাংলার যুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক উত্তেজনা ঢোকাবার সম্ভাবনা নেই—ইংরেজ তার ভাষা সমেত বহু দিন আগেই চলে গেছে—এই উপ-মহাদেশে আজ যে ইংরেজি চলছে তা কয়েক প্রজন্ম ধরে এদেশের মানুষের নিজ-ভূমিতে উৎপন্ন ও বিধৃত হয়েছে। ইংরেজি যে বাংলা ভাষাকেও পুষ্ট করেছে ও করছে তাতেও তো সন্দেহ নেই—বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ যদি একেবারে উড়িয়ে না দেওয়া যায় তাহলে তো মানতেই হবে তা এনেছিলেন ইংরেজি শিক্ষিতেরাই। আজ যদি ইংরেজি শিক্ষার পথ সংকীর্ণ করা হয়—তাহলে নূতন নূতন চিন্তাধারার প্রবাহ বয়ে আসবে না। আমরা ক্রমে কূপমণ্ডূক হয়ে যাবো এ সংশয় অনেকেরই মনে আছে। যদি ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন না হতো তাহলে রামমোহন কি জন্মাতেন না বিদ্যাসাগর— ? আজও কি সতীদাহ চলত না? কুলীন ব্রাহ্মণ অবিবাহিতা কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করে বেড়াতেন না? জাপানের দৃষ্টান্তও তো অনেকে দিলেন জাপানে তো ইংরেজি ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচারিত নয়—কিন্তু জাপানীরা তো বিরাট সমৃদ্ধি অর্জন করেছে অন্তত ধন গরিমায় তারা কারু চেয়ে কম নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হারিকিরি আজও চলে যা সতীদাহের মতই একটি ভ্রান্ত মূল্যবোধের উপর স্থাপিত। জাপানী মেয়েরা নানা কাজে এগিয়েছে ভারতীয় মেয়েদের চেয়ে, ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদে তাদের বাহ্যিক আধুনিকত্ব ঘোষিত তবু অন্তরের দিক থেকে তারা কি সত্যিই সমমর্যাদা লাভ করেছে? আইনত মেয়েদের অধিকার কতটা স্বীকৃতি পেয়েছে জানিনা কিন্তু তাদের 'গিইসা' ক্লাবগুলির কথা যা পড়া যায় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় মেয়েদের স্থান নানাভাবেই এখনও মধ্যযুগীয় মনোভাবে আক্রান্ত।

আজ বাঙলা দেশের মুসলমান মেয়েরা অনেক দূর এগিয়েছেন, বোরখা উঠে গেছে ঠিকই। পড়াশুনো করছেন, স্কুলে কলেজে তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে বছর বছর

কিন্তু প্রথা বা সংস্কারকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে সাহসী হচ্ছেন ক'জন ? পলিগ্যামি এখনও বহাল তবিয়তে আছে। এবার তো বিশ্বনারী দিবস—ঢাকায় মেয়েদের তাই জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েদের সমানাধিকার সম্বন্ধে কি ভেবেছেন আপনারা। অন্তত বহু বিবাহটা নিষিদ্ধ হওয়া চাই, নিষিদ্ধ হওয়া চাই নির্বিচার তালাক। অনেকেই বলতে লাগলেন আজকাল যা অর্থনৈতিক অবস্থা—চারটে বিয়ে করবে কে ? অন্য কেউ যা বলতে লাগলেন আমাদের ধর্মের অনুজ্ঞা খুব সুস্পষ্ট এবং তাতে অবিচার নেই—এমন ভাবে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে যে চারটি স্ত্রীকেই সমান চোখে দেখতে হবে তা কেউ পারে না, তার অর্থই বহু বিবাহ করো না। কিন্তু তালাক ব্যবস্থাটা কি রকম ভাবে সম বিচারের দ্যোতক তা অবশ্য বুঝলাম না। কেউ কেউ তো স্বীকারই করছেন না যে বিনা কৈফিয়তে তিনবার তালাক বল্লেই পরিণীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায়। তাদের বক্তব্য নানা ওসব আর হয় না। যখন আমার জানিত একটি ঘটনা বল্লাম যে টেলিগ্রামে তালাক দেওয়া হয়েছে তখন তাঁরা বল্লেন তা অবশ্য হয় কখনো সখনো।

অর্থাৎ একটা মূঢ় স্বজাতি প্রেম যাকে কখনো কখনো দেশপ্রেম বলেও চিহ্নিত করা হয় তা কখনো মানুষের মনকে এমনই শৃঙ্খলিত করে ফেলে যে দেশের গণ্ডীর বাইরে না দাঁড়িয়ে অর্থাৎ খানিকটা দূরে না গেলে সত্যদৃষ্টি লাভ হয় না তার অর্থ ভৌগোলিক দূরত্ব নয়, মনের নৈর্ব্যক্তিক চেতনা ও যুক্তিবাদের উন্মেষ হওয়া চাই। সেজন্য বহির্জগতের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন। একজন বিদগ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি বারবার বলছেন কোরাণে যা আছে তা এরকম নয়, তা নারীর প্রতিকূল নয়—কিন্তু যদি কোরাণে তা না থাকত তাহলেও কি আপনি বলতেন না যে নারীর সমমর্যাদা প্রয়োজন ? দেড় হাজার বছর আগে যে চিন্তা উদ্ভূত হয়েছিল আজও কি সেখানেই নির্দেশ খুঁজতে হবে ? মানুষ কি আজকের প্রয়োজন অনুসারে নিজের ভাগ্য স্থির করতে পারবে না শাস্ত্রের খোঁয়াড়ে নজরবন্দী হয়ে থাকবে ? এ প্রশ্নের উত্তর তো পেলাম না বটেই মেয়েদের মনে এ প্রশ্ন উঠেছে বলেই মনে হল না। কত জন মেয়ে গতানুগতিক ব্যবস্থা অনুসারে স্কুলে কলেজে পড়ছে তার সংখ্যা গণনা করেই কোনো দেশের প্রগতির নির্ণয় হয় না, সেই দেশের নারী পুরুষ সকলেই কতটা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছে সমাজ-ব্যবস্থায় সাম্য ও সুবিচারের প্রবর্তনের চেষ্টা করছে সেটাই মূল নির্ধারক। দেশ-বিদেশের চিন্তা স্রোতের সঙ্গে মিলিত না হলে সমাজে ক্রমাগতই চড়া পড়ে যায়, "আচারের মরু বায়ু" এসে পড়ে "বিচারের স্রোতঃ পথ" রুদ্ধ হয়ে যায়।

আজ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই মনে করে ইংরেজি ভাষা যেটা উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি তার শক্তি আমাদের বহু দিকে শক্তিমান করেছে। তাই যতই উচ্চ কণ্ঠে মাতৃভাষার মহিমা ঘোষণা করা হোক ইংরেজি বর্জন তো নয়ই নিজের সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ বাড়তেই থাকছে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা গেল কিন্তু ইংরেজিয়ানার ত্রুটিও তো কম নয়। ছেলেমেয়েদের ভাষা শিখিয়ে, সাহিত্য পড়িয়েই তো আমরা সন্তুষ্ট নই আদবকায়দারও অনুকরণ দেখি তেমনি বেনো জলের মত ঢুকছে যাতে একটা

জাতিকে মূল থেকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে। বিদ্যা কতটা হল ঈশ্বর জানেন কিন্তু হুইস্কির বোতল শূন্য করা, বিলিতি ধরনে হাসি আর বিলিতি ধরনের কাশির প্রবর্তন ছেলেমেয়েদের মনকে **thriller** আর **paper back** হাল্কা যৌন পঙ্কের দিকে যত টেনে নিয়ে যাচ্ছে তত দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও চিরন্তন মূল্যবোধগুলি নাড়া খাচ্ছে। বিলিতি ইস্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা **Junior Statesman** পড়ে যে দেশকে তারা জানছে সে তার মাতৃভূমি নয়। সে তার সমাজ নয় দেশ নয়। ইংরেজি স্কুলের পড়িয়ে ছেলেমেয়েরা একটা কৃত্রিম অলীক জগতের মানুষ হয়ে যাচ্ছে এর ফল যে ক্রমেই আমাদের নিজ বাসভূমে পরবাসী করে দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

উপায় কি ? জানিনা উপায় কি। বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষরা ভাবছেন। আমাদের এ দেশেও ভাবতে হবে। আমরা বিশ্বমানব হব অথচ স্বদেশীও থাকব —আমরা দুধও খাব ঘোলও ছাড়ব না। কাজেই হঠাৎ সমাধান হবে না। ভাবতে হবে।

সমাজ সেবায় সকলের অধিকার

আমাকে বলতে বলা হয়েছে সমাজ সেবা সম্বন্ধে কিন্তু টাইটেলটা একটু আশ্চর্য "সমাজ সেবায় সকলের অধিকার"—সমাজ অর্থ আমাদের পরস্পর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী—যাদের সঙ্গে আমাদের সুখ-দুঃখের কোনো সম্বন্ধ নেই তারা আমাদের সমাজের কেহ নয়। সমাজকে বিভিন্নভাবে দেখা যায়, আত্মীয় সমাজ, ধর্ম সমাজ। কর্ম-ক্ষেত্র হিসাবেও ভাগ করা যায় শিল্পী সমাজ, গায়ক সমাজ, ব্রাহ্মণ সমাজ ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা বাদ দিয়ে এক বিরাট মানবসমাজ আছে সেখানে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে ভাবতেই হবে। যে সমাজে যত মানুষ অন্য মানুষের হিতাহিত নিয়ে চিন্তা করবে ও নিজের জ্ঞান বুদ্ধিমত অপরকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবে সে সমাজ ততই সঙ্ঘবদ্ধ হবে ও প্রতিটি মানুষের উন্নতির পথ সুগম হবে। কাজেই সমাজ সেবায় সকলের অধিকার আছে কি নেই সে প্রশ্ন তো ওঠে না। কারণ এক অর্থে সমাজ সেবা অর্থ নিজেরই সেবা। সমাজের মঙ্গল অর্থ নিজেরই মঙ্গল এ কথাটা বাস্তব সত্য, কোনো তত্ত্ব নয়। আজ আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে মনে হয় কারুই স্মরণ নেই যে আমি আমার দল বা গোষ্ঠী বৃহৎ মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারি না। আমি যতই উচ্চ অট্টালিকায় বাস করি আমার পাশের বস্তিতে কলেরা লাগলে তা যে আমার বাড়িকেও আক্রমণ করবে না তা হবে না। দেশে যখন দারিদ্র্য বাড়তেই থাকে, গ্রামগঞ্জ শহরের পথে পথে নোংরা দুর্গন্ধ শরীর অভুক্ত মানুষের মিছিল চলে তখন দু একজন বহু গাড়িতে পথ দিয়ে চলে সমৃদ্ধির আনন্দ উপভোগ করেন বটে কিন্তু বিপদের সংকেত শুনতে পান না। আজ দেশের মধ্যে ঐ বিপদের সেই ঘনঘটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। দুর্যোগ কি মারাত্মক। আজ ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে চড়েও কেউ নিরাপদ নয়। তার

আরামের ব্যবস্থাও ছিন্নভিন্ন প্রতি পদক্ষেপে, বিপদ মাথা উঁচিয়ে রয়েছে।

অনেকের ধারণা সমাজসেবার অর্থই হচ্ছে দুঃস্থ অনাথ আতুরের জন্য কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করে তাদের অন্ন বস্ত্র বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বহু সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তারা প্রায় সকলেই মানুষের কায়িক দুঃখ-কষ্টের সমাধানের চেষ্টা করছে। হয়ত কেউ কেউ তার সঙ্গে প্রথাসম্মত সাম্প্রদায়িক ধর্মের এটাও বজায় রাখছে। কিন্তু তার বেশি নয়। নৈতিক বোধ যা কতগুলি আচারের সমষ্টি মাত্র নয় যা মানুষের সমাজ চেতনাকে জাগ্রত রাখবে—সেই আসল ধর্ম যা মনুষ্যত্বকে ধারণ করবে তার চর্চা কি? আজকে আমাদের দেশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমি কেবল সেই কথাই ভাবছি যে সমাজসেবা বলে যে সব কাজ আমরা করে গর্বিত তার মূল্য কতটুকু? গুঁড়ো দুধ গুলে খাওয়ান—আর ইস্কুলে রুটি বিলি করা—এক এক দিন মোবাইল ক্লিনিক নিয়ে বস্তিতে যাওয়া এই সবই সমাজসেবা—কিংবা মহিলা সমিতিতে সেলাই ফোঁড়াই? এ ধরনের সেবার আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে। বহু প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে—বহু মহিলা সমিতি কর্মব্যস্ত। বিদেশীরাও সাহায্য করছে, অনুদান দিচ্ছে কিন্তু আজকে দেশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে মনে হয় কি যে এই সব সেবা করে দেশকে আমরা সুস্থ করে তুলেছি? অসুস্থতা যে ক্রমেই বাড়ছে।

সমাজকে সুস্থ করার প্রধান এবং প্রথম কাজ যেখানে সুরু হওয়া উচিত সেখানে আমরা হাতই দিই নি। দারিদ্র্যই একমাত্র রোগ নয় সবচেয়ে গুরুতর ব্যাধি সমাজবোধ হারিয়ে ফেলা। মানুষ হিসাবে যে দায়িত্ব আছে স্বার্থবোধের দ্বারা যখন তা ঢেকে যায় তখন সমাজ ভাঙতে থাকে। আমরা যারা সমাজসেবা করি বলে গর্বিত তাদের মাথা হেঁট করবার দিন এসেছে। অন্য দেশের কথা জানিনা কিন্তু এই কবি, দার্শনিক, শিল্পীর দেশ ভারতবর্ষে আজ অর্থই প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার জন্য যে কোনো রকম অন্যায় করা চলে। অর্থের এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার কারণ দারিদ্র্য নয় লোভ।

লোভ বিকট মুখ ব্যাদন করে আছে সমাজের সর্বস্তরে—উচ্চ নীচ নেই। ফল লাভের জন্য কোনো অন্যায়কেই আমরা অন্যায় মানছি না। স্কুলের স্তর থেকে টোকাটুকি অবাধ রয়েছে, সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাটার মধ্যে কি ভয়ানক মিথ্যাচার চলছে। একটা যন্ত্রের হাত ধরে সহস্রটা এসে জুটে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর একটা বড় কলঙ্ক র‍্যাগিং। নৃশংসতার দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করার এই অপবিত্র জঘন্য উল্লাস চলে আসছে দিনের পর দিন অথচ কারু সাহস নেই যে বাধা দেয়। শিক্ষক যেখানে ছাত্রদের ভয়ে ভীত সেখানে নৈতিক অবনতির নিম্নতম ধাপ বেরিয়ে পড়েছে। সমাজের যেদিকে তাকাবে সেই দিকেই বিভৎসতা মুখ ব্যাদন করে আছে। প্রতিদিন কাগজ খুললে শুধু হত্যা নয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যার বিবরণ চোখে পড়ছে। ১৫ বছর আগেও এমন ছিল না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হত্যা ও নিষ্ঠুরতা কিছু হয়েছে বটে তবে তা সাধারণ মানুষকে এমন খণ্ড করে তোলেনি। দেশ ভাগের আগে গুণ্ডার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল রাজনৈতিক দাঙ্গা। ধর্মের একটা উত্তেজনা তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক ভ্রষ্টতা থেকে উদ্ভূত হয়ে হিংস্রতার দানব যেন বহু সাধারণ মানুষের

বুকের মধ্যে পৈশাচিক নৃত্য সুরু করেছে। তা না হলে পথের মধ্যে মানুষ পিটিয়ে মারলে অন্য মানুষরা বাধা দেয় না কেন? কেন অকারণ হিংস্রতা নিজের ধর্মের সমাজের গণ্ডীর মধ্যেও এমন ব্যাপক হয়ে উঠছে। যদি এই দানবকে আমরা বুঝতে না পারি। যদি টেন কমাণ্ডমেণ্টসের প্রধান অনুশাসন thou shall not kill না মানি—তবে আমাদের সমাজ থাকবে কোথায়? কোথায় কোন শ্মশানে আমরা আমাদের সন্তানাদি রেখে যাব?

সমাজসেবার প্রথম প্রয়াস যদি মানুষকে মানুষ হতে সাহায্য করা না হয় তাহলে কোনো প্রয়াসই কাজে লাগবে না। এই প্রয়াস রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের লোভের বিড়ম্বনা তাকে অন্য পথে ক্রমাগত প্ররোচিত করছে সে জানে না বিপদ কি ভাবে এসে পড়তে পারে তার নিজেরই সংসারে। এর একটি দৃষ্টান্ত ঘটেছিল কয়েক বছর আগে ভেজাল তেল খেয়ে চারশ লোক পঙ্গু হল আর যে মুদী ঐ কীর্তি করেছে অসাবধানে তারও পরিবার সেই একই দুর্ভোগে পড়ল।

দেশের এই নৈতিক অবক্ষয় কাউকে রেহাই দেবে না কোনো না কোনো উপায়ে প্রত্যেককেই বিনষ্ট করবে।

সেজন্য আজকে সমাজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষরা যদি মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করতে সহায়তা করেন। মানুষ যদি পশুত্বে নেমে যায় তবে সেবা করবেন কার? মানুষের সমাজবদ্ধ শরীরের এক জায়গায় পচন ধরলে সবটাই মরে যাবে। শুধু অন্ন বস্ত্র রুটি আর গুঁড়ো দুধ নয় **not by shed alone.**

এক সময়ে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছিল তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপুল প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন দিকে বিভিন্নভাবে মনুষ্যত্বের চর্চা চলে ছিল। তাঁরা যে শুধু ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন তা নয়। চরিত্রকে উন্নত করবার কত দিক থেকে কত চেষ্টাই না চলছিল। বড় বড় খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার যারা সাজে-পোষাকে ইংরেজ সেজেছিলেন তাঁরা খদ্দর পড়লেন। নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না। ফাঁসীর প্রতীক্ষায় বসে দিনেশ বলাকার কবিতা আবৃত্তি করছেন, যে সব চিঠি লিখছেন তাতে তাঁর মনের উচ্চতা, স্নিগ্ধতা ও গভীর আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পেয়েছে। এমনিই ছিল আমাদের দেশ। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও যারা সত্যকে ভোলে নি আদর্শকে স্বার্থের চেয়ে বড় মনে করেছেন। এরা যে সমাজসেবা করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন - সেকি কিছু চোরা কারবারী, খুনে এবং লম্পট তৈরী করবার জন্য?

চারিদিকে মেয়েদের প্রতি কুৎসিত অত্যাচার দলে দলে সংঘর্ষ, ডাকাতি, ব্যাংক লুট নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু নয় দেশের মানুষের বুদ্ধির স্বচ্ছতা, যুক্তির নির্ভরতা, সত্যে প্রতিষ্ঠ হওয়ার জন্য একটা সামগ্রিক চেষ্টাই আজকের দিনে প্রকৃত সমাজ সেবা। এই কাজ মাতৃরূপে, বধূরূপে, কন্যারূপে মেয়েরা যেমন করে করতে পারেন তেমন পুরুষ পারবে না। পুরুষকে তৈরী করবার ভার মেয়েদের উপর। দুঃখের বিষয় এই প্রজন্মের মেয়েরা সে কাজে তেমন ভাবে সফল হন নি। **women's lib** নিয়ে যত লাফালাফি হচ্ছে তত

মেয়েদের নিজস্ব দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রকাশ হচ্ছে বলে মনে হয় না। আজ সমাজ অনেক বদলেছে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখছেন, অনেক বিষয়ে তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ হয়েছে অবশ্যই কিন্তু যে দিকে তাঁরা বিশেষত্ব দেখাতে পারতেন যেমন নৈতিক চেতনার উদ্বোধন করে, সে দিকে তো কোনো চেষ্টা দেখা যায় না পরন্তু জিনিষ-পত্রের লোভের তাড়নায় পুরুষকে ভ্রষ্ট করেন।

রবীন্দ্রনাথের সবলা কবিতাটা খুব পড়া হয় পরে 'প্রতীক্ষা' বলে একটি আশ্চর্য কবিতা আছে যা একেবারেই পড়া হয় না কারণ অর্থটা হয়ত সকলের কাছে স্পষ্ট নয়। সমাজ যখন অবক্ষয়ের দিকে যায় তখন মেয়েরা কি করতে পারে তা এখানে বলা হয়েছে। পুরুষের শৌর্য বীর্য জেগে উঠবে সেই কল্যানী নারীর আহ্বানে—যে পঙ্কিলতা থেকে পুরুষকে উদ্ধার করবে তথা সমগ্র সমাজকে।
এই কথা বলতে গিয়ে বর্ণালীর কথা মনে হচ্ছে এই মেয়ে পুরুষের বীভৎস নৃশংসতার স্বীকার হয়েছে এরকম হচ্ছে শত শত মেয়ে কিন্তু সে কি কেবল পুরুষেরই লজ্জা মেয়ের নয়? এরা তো কোনো মায়ের সন্তান কোনো মেয়ের কোলে তো এরা মানুষ হয়েছে—সেখান থেকে কি অপবিত্রতা এদের রক্তে প্রবেশ করেছিল কে জানে।

বস্তুত সমাজের অবস্থা যখনই এমন পঙ্কিল হয়েছে তখনই নারী শক্তির কাছে সমাজ আশ্রয় চেয়েছে। দশপ্রহরণধারিনী তখনই অসুরকে দমন করেছেন তখনই গান্ধারী ধর্মকে রক্ষা করতে চেয়েছেন দুর্বৃত্ত পুত্রকে নয়।

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে
অয়ি অনাগতা অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।
দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্ন তাপিত
অনিদ্রায় রজনী যাপিত।
শুষ্ক বাক্য বালুকার ঘূর্ণিপাক ঝড়ে
পথিক ধূলায় শুয়ে পড়ে।
নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা
হে কল্যানী তুমি নিষ্কলুষা
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণ ভরা সৃষ্টির নিঃশ্বাস
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে উর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।

ধূসর প্রদোষে ত্যাজি অন্ত পথ জুড়ে
নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে ।
আলো-আঁধারের পাকে না মেলে কিনারা
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা
যাকে দেশ মোহের দীক্ষারে
কাঁদে দিক বিধির ধিক্কারে
ভাগ্যের ভিক্ষুক চায় কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ
ধূলিতে খুঁটিয়া তোলা বহুজন উচ্ছিষ্ট প্রসাদ
কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে ক্লিন্ন গ্লানি
কলহেরে শৌর্য বলে জানি
ভাবি দুর্যোগের সিন্ধু তবিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায় ।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি
আশক্তি মজ্জায় রক্তে ?
শক্তি বলি জানি ছলনাকে
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে
হে বানীরূপিনী বানী জাগাও অভয়
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়
চিত্তেরে তুলুক ঊর্দ্ধে মহত্তের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে
হে নারী হে আমার সঙ্গিনী
অবসাদ হতে লহ জিনি
স্পর্দ্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ
হে সতী সুন্দরী আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।।

লাল ফিতা

প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ খুললেই একটা না একটা নূতন আইনের খবর আমাদের চমকে দেয়। আইনগুলো যে খুব সদুদ্দেশ্যে হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের অবকাশই নেই কারণ প্রত্যেকটা আইনের হিতকারীত্ব সম্বন্ধে আমরা বহু মনোহারী বচন রেডিওতে, টেলিভিশানে, বড় বড় বক্তৃতায় শুনতে পাই এবং বার বার শুনতে শুনতে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। আমরা একমত হই, জনগণের মধ্যে একটা ঐক্য আসে। যেমন এখন আমরা বুঝতে পেরেছি বিনা বিচারে, বিনা কারণ দর্শিয়ে, (বিনা কারণে নয় অবাধ) দু বছরের জন্য বন্দী করা হয়। আমরা জানি এটা দেশে মঙ্গলের জন্য। কারণ, গুরুতর কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেটা কেউ জানতে পারছে না। দোষীও নয় বিচারকও নয়। অনেকটা পূর্ব-জন্মের অপরাধের জন্য এজন্মে শাস্তি পাওয়ার মত। এটা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্হী একেবারেই নয়, যখনই কোনো সৎ, ভদ্র, ভালো মানুষকে নানাভাবে ঈশ্বরের হাতে লাঞ্ছিত হতে, শোকে দুঃখে দারিদ্র্যে কষ্ট পেতে দেখি আমরা জানি লোকটা এখন বেশ ধার্মিক ভদ্র ও পরোপকারী হলেও পূর্ব জন্মে নিশ্চয় দুর্বৃত্ত ছিল—এই ভেবে যে আমাদের মধ্যে সুবিচার প্রত্যাশী চেতনা আছে। যে আমাদের বিবেকের মতই অর্থলিপি জাগ্রত থেকে কেবল বলে মানুষের জগতে "জাস্টিস উইল বি মিটেড"—সেই চেতনাকে ঠাণ্ডা করে রাখি। ঠিক সেই নিয়মেই চেনা পরিচিত মোটামুটি ভদ্রলোককে বন্দী দেখলেও আমাদের মনে হয় লোকটার কোনো অজ্ঞাত গভীর অপরাধ নিশ্চয়ই আছে যে কারণে দেশের নিরাপত্তার জন্য তাকে বছর দুই অন্তত বন্ধ করে রাখা দরকার। অবশ্য অপরাধীর শাস্তির যে দুটো কারণ আমরা বরাবর শুনে এসেছি একটা সেই ব্যক্তির সংশোধন আর একটা সমাজের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন এ দুটি সিদ্ধ হয় না। লোকটা জানেই না তার অপরাধ কি অর্থাৎ তাকে জানান হয়নি সমাজেরও কেউ জানে না কেন যে শাসিত পত্রপত্রিকাও নীরব কাজেই শাসনের ঐ দুটি উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হচ্ছে না। তা হোক বিচারালয়ের যা অবস্থা একটি বিচার সুসম্পন্ন হতে বছরের পর বছর কেটে যায় এই ভাবে চললে দেশে দুর্বৃত্তের উৎপাত দূর হওয়া মুস্কিল। তাই বিচারের এই শর্টকাট ভালই হয়েছে যদিও ইংরেজের আইনে একটা কথা ছিল, যে সহস্র দোষীও যদি ছাড়া পায় একটি নির্দোষী যেন শাস্তি না পায় তাই বিচার ব্যবস্থা জটিল ও সময় সাপেক্ষ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজের করা এই সব উদ্ভট নিয়মগুলো জীইয়ে রাখার এখন কোনো প্রয়োজন নেই। ইংরেজদের অমন সুন্দর সুন্দর ঘোড়া সওয়ার মূর্তিগুলো তুলে ফেলে দিয়ে ইংরেজের ইতিহাস এদেশ থেকে লুপ্ত করে দিয়েছি। এখন কিছুদিন পরে লোকে আর জানতেই পারবে না যে এদেশ একদিন পরাধীন ছিল। এখন স্বাধীন দেশে নিজেদের ঐতিহ্য অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা তৈরী করা উচিত। যেমন জাতি অনুসারে

শাস্তি বিধান ছিল মনুর ব্যবস্থা সেটাই একটু সময়োপযোগী করে চালু করা দরকার। একই অপরাধে ব্রাহ্মণের পাঁচ কড়ি দণ্ড, শূদ্র শূলে গেল। এখন আমরা জাতিভেদ তুলে দিয়েছি কিন্তু অন্যরকম জাতি আছে। যেমন দুর্বৃত্ত যে সব রাজনৈতিক পার্টি আছে তাদের সম্বন্ধে জাতিভেদ প্রযোজ্য-কোনও পার্টি ব্রাহ্মণের সুযোগ-সুবিধা পাবে কেউ বা ক্ষত্রিয়র কেউ বা শূদ্রের। এখন অবশ্য শূদ্রের পার্টিরই আধিক্য বেশী তাই শাস্তির ক্ষেত্রেও তারতম্য হবেই এবং দেশের দ্রুত উন্নতির জন্যই বিচার প্রথার শর্টকাটের আবশ্যক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বোধহয় শর্টকাটের কথা শুনেছিলেন তাই তিনি লিখেছেন "ইংরেজিতে যাকে শর্টকাট বলে আদিম কালের ইতিহাসে তাহা চলিত ছিল···সভ্যতার একটা দায়িত্ব আছে। সকল সংকটেই সে দায়িত্ব তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। শাস্তি দেওয়ার মধ্যে দারুণতা অনিবার্য বলিয়াই শাস্তিটাকে ন্যায়-বিচার প্রণালীর ফিলটারের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত রাগ দ্বেষ ও পক্ষপাত পরিশূন্য করিয়া সত্য সমাজ তবে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে।"··· কিন্তু এ প্রণালীতে বিলম্ব ঘটে। সামন্ত যুগে সে সময় থাকতে পারে বর্তমানে ডেমোক্রেসীর যুগে তা সম্ভব নয়। তাহলে ডেমোক্রেসীই নষ্ট হয়ে যাবে!

বিচারের ব্যাপারে একটা শর্টকাট পাওয়া গেছে ঠিকই কিন্তু নিত্য নূতন নিয়মগুলি এখনও লাল ফিতার বন্ধন কাটাতে পারে নি। এক একটা নিয়ম হয়—আর কিছু মিডল ম্যান জুটে পড়ে। যখন ল্যান্ড সিলিং হল, তার গাদা গাদা ফর্ম তৈরী হল; কিন্তু উকীল মোক্তার জজ কেহই ঠিকমতো ওয়াকিবহাল নন কি করে কি হবে। যে কোনো মফস্বল কোর্টে গেলেই বোঝা যাবে যে দরিদ্র লোকদের দুঃখ দূর করার জন্য এই সব বিপুল নিয়মাবলী তারাই সেই নিয়মের জালে ছট-ফট্ করতে শুরু করে। কারণ নূতন নিয়ম যখন হয় উকীল মোক্তার মুহুরী জজ পর্যন্ত কেউই সঠিক জানে না করণীয়টা কি। ফর্মগুলো বেপাত্তা হয়ে যায় তখন সরকারী ছাপান বিনামূল্যের ফর্মের ব্ল্যাক মার্কেট শুরু হয়।

রহমত আলিকে জিজ্ঞাসা করা গেল রহমত তোমার কতটা জমি আছে? এই চার বিঘা চাষের আর বার চৌদ্দ কাঠা বসতজমি। মিউনিসিপ্যালটির মধ্যে পড়ে নি ত? জী হাঁ। সরকারকে হিসাব দিতে হবে? হাঁ হুজুর। দিয়েছ? বাপজান হাঁটাহাঁটি করতে লেগেছে হুজুর—কত কাগজপত্তর—লেখতে জানি না পড়তে জানি না, জন মজুর খাটি আব্বা তা আজ সাতদিন ধরে কোর্ট-কাছারী করছে হুজুর। প্রত্যেক জনে এ্যাকেক রকম কয়। দু'ই কাঠা জমি বিক্রি করার দরকার ছিল সে আর হল না। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করা গেল যে সব ব্যাপারটাই তাদেরই ভালোর জন্য হচ্ছে। আমরা যে তাদের শোষণ করি সরকার সেই শোষণ বন্ধ করবেই সেজন্যই রোজ রোজ নূতন নিয়ম হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বোঝাবার অক্ষমতার জন্য এবং লাল ফিতার ফাঁসের বন্ধকে ছট-ফটানোর জন্য আমাদের কথা তার বোধগম্য হল না।

শাস্তি দেবার প্রণালীর শর্টকাটটা ভালই হয়েছে এখন ডেমোক্রেসীকে রক্ষা করার জন্য এত আইন-কানুনের ফাঁস না করে আর একটা শর্টকাট দরকার। দেশের উৎসাহী উদ্দীপনাময় যুবকদের লাগিয়ে দিলে তারা কোনো একটা চালনীর মত যন্ত্র নিশ্চয় বের করতে পারবে যাতে অডেমোক্রেটিক প্রতিক্রিয়াশীল দুর্বৃত্তদের

আগাছা বেছে ফেলে—ডেমোক্রেসীতে অবিচল, প্রগতিশীল, গরীবের দুঃখ দূর করতে কৃতসংকল্প মানুষদের পৃথক করতে পারবে। তারপর আগাছাদের যা গতি তাদের তাই করলেই হবে। গর্ত খুঁড়ে কবর। এই রকম শর্টকাট করতে পারলে রাজ্য চালনার অনেক সুবিধা হয় নিশ্চয়ই— ।

মাঝে মাঝে কোনো অবিবেচক দেশদ্রোহী প্রশ্ন করতে পারে বটে যে কেন কি হচ্ছে কিছু জানতে পারলাম না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞান পিপাসা মিটিয়ে ডেমোক্রেসী তো সম্ভব নয়।

এই লোকেরা হয়ত রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলতেও পারেন রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থল এবং প্রবল ব্যক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্বল ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু। রুদ্ধবাক সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ংকর অবস্থা।

তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুরপনেয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরোত্তর খরধার হইয়া উঠিতে এবং প্রজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত ও নির্বাক নৈরাশ্যে বিষ তিক্ত হইতে থাকিবে······অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজা-প্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি। এই কথাগুলি কলোনীয়াল ইংরেজদের সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল তাই এখন আর এ ভয়ের কারণ নেই। এখন তো আমরা বিদেশী সরকারের অধীন নই—এখন আমরা স্বাধীন।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নূতন করে একটি কথার আলোচনা হচ্ছে যে, সমসাময়িক হয়েও রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ এই দুই বিরাট পুরুষ পরস্পরের সম্বন্ধে নীরব ছিলেন কেন। তাঁদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব কি ছিল। বলা বাহুল্য এতদিন পরে সে নীরবতার মর্মভেদ করতে গেলে অনেকটাই কল্পনা ও অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়, অনেকেই তাই নিয়েছেন। এই নীরবতা যে একটু বিস্ময়কর তাতে সন্দেহ নেই, কারণ বহু বিষয়েই তাঁদের কর্ম ও মতের ঐক্য ও সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

সমাজচেতনা ও গভীর মানবমূল্য বোধ, দুজনেরই কর্মের প্রেরণার মূলে এই দুটি ভাব প্রবল। বিবেকানন্দ ধার্মিক, বৈদান্তিক, আবার তিনি একজন প্রবল হিন্দু কিন্তু সে ধর্ম, সে হিন্দুত্ব লোকাচার নয়; সংস্কারের বন্ধন নয়। মানব-ভাবনার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব দেশপ্রেমের রসায়নে তিনি যেন সে সমস্তকেই 'হিন্দু' করে নিয়েছেন। তাই তখনকার দিনের আচারবদ্ধ সমাজ তাঁকে বদ্ধ করতে পারে নি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে, পতিতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন "ভাতের হাঁড়ির" ধর্ম চুরমার করে দিয়ে। ডাক দিয়েছেন ভারতবর্ষের তাঁতি, তেলে, মুচি, চাষী, সকলকে।

রবীন্দ্রনাথ ধনী, কবি এবং এক নূতন ধর্ম-অভ্যুদয়ের মধ্যে তাঁর জন্ম, তবু তাঁর

ঐশ্বর্য কবিত্ব সুকুমার শিল্পবোধ ও যুক্তিবাদী ধর্ম, কিছুই তাঁকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ় জনসাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে নি। তিনিও নেমে এসেছেন তাদেরই মধ্যে যাদের কর্মক্ষেত্রে 'ঘর্ম পড়ে ঝরে', যোগ দিয়েছেন তাদেরই কাজে যারা 'দীনের অধম দীন'।

জনগণের আপন সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহের সঙ্গে জাগিয়ে তোলা, তাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল চেষ্টায় নানা কর্মের সূচনা করা, এ সবই দুই মহাপুরুষের কর্মজীবনের লক্ষ্য। দেশে এবং বিদেশে তাঁদের চিন্তা এবং কর্মের ঐক্যই সহজে লক্ষ্য হবে। দুজনেই সভ্যতা গর্বিত ইয়োরোপ ও আমেরিকায় ভারতবর্ষের যা শ্রেষ্ঠ চিন্তা, তার সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ ফল তাই হাতে নিয়ে রাজার মত বেশে, দাতার মত বেশে গিয়েছিলেন। সে যুগ ছিল এশিয়ার মানুষের ইউরোপের কাছে শিক্ষানবিসীর যুগ, তারা কৃপাপ্রার্থী রূপেই গর্বিত শক্তিমত্ত ইউরোপের কাছে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ করত। তখন ভারতবর্ষের এই দুই মহাপুরুষ বিস্মিত ইয়োরোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন বলেছিলেন 'অয়ম্ অহত ভো', আমি এসেছি—ভারতের এই স্বরূপ দেখ।

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন আমাদের যা শ্রেষ্ঠ তা দিতে পারলে তবেই আমরা অন্যের যা শ্রেষ্ঠ তা দাবি করতে পারি, তখন এ কথা পূর্ণরূপে বোঝা সহজ ছিল না।

একজন জাপানী লেখকের কাছে শুনেছিলাম যে সে সময়ে জাপান ও সমগ্র এশিয়াতে ইয়োরোপের প্রভাব এমন ব্যাপক হয়েছিল যে 'পথের অশন পরের ভূষণ' তো বটেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণের প্রবল স্পৃহায় তাড়িত মানুষ নিজেদের বহুদিনের শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতা সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেছিল। সেই সময়ে ইয়োরোপে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের আচার-আচরণ বেশভূষার দিকে তাকিয়ে তাঁরা বুঝেছিলেন যে সভ্য হবার জন্য ইউরোপীয় হবার কোন প্রয়োজন নাই। এ কথা বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও একই রকম সত্য। তাই বলে অবশ্য যে কেউ কুর্তা জহর কোট বা প্রিন্স কোট্ পরে বিলেতে যাবে তার সম্বন্ধেই আর একথা প্রযোজ্য নয়, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর তাই নিজেদের জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত করেছিলেন বলেই বাহ্য পোষাকও তার সঙ্গতি রক্ষা করেছিল। দেশী কুর্তা পরে বল নৃত্য করলে যে নির্লজ্জ পরানুকরণপ্রিয়তা প্রকাশ পায় সেখানে পোষাকের দ্বারা তার শোধন হতে পারে না। একথা আবার আজকের উন্মত্ত অনুকরণের দিনে মনে করার প্রয়োজন হয়েছে।

আরও একটা দিকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও চিন্তার ঐক্য আছে, দুজনেই তখনকার সাধু সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলার যুগে চলতি ভাষার ব্যবহার শুরু করেন। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ অগ্রণী। দুজনের ব্যবহৃত কথ্য ভাষার মধ্যে অবশ্য অনেক পার্থক্য রয়েছে কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ভাষাকেই সর্ব রকম চিন্তার বাহন করবার মূলে যে মানবহিতৈষণা সে একই। জনসাধারণের সঙ্গে চিন্তার ভূমিতে মিলিত হবার ইচ্ছা, মানুষের গভীরতম ভাবনার উপর সকলের যে অধিকার ভাষার ব্যূহ দ্বারা ব্যাহত করা হয়, সেই বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে মনের মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

এমনি ছোট বড় বহু বিষয়ে উভয়ের মিল আছে। কিন্তু পার্থক্যও আছে

অনেক। সেই পার্থক্য চরিত্রের গভীরে স্থিত। যার ফলে জীবনভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গেছে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ কেন কখনও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করেন নি বা রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই লেখেন নি একথা অনুমান করা কঠিন নয়। দুজনেই দুজনের মহত্ত্ব নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন কিন্তু চরিত্রগত ও ভাবগত পার্থক্যের জন্য পরস্পরের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেন নি। একথা অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয় যে বিবেকানন্দ যদি অত অল্প বয়সে না মারা যেতেন, তাঁর জীবন যদি আরও বহুতর কর্মের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হতে থাকত তাহলে ক্রমে তাঁরা নিশ্চয়ই নিকটে আসতেন যেমন এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। উভয়ের মতানৈক্য তো উভয়েই প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু সে মতেরই অনৈক্য মাত্র, তার বেশী নয়।

আজ অনেকে রবীন্দ্রনাথের লিখিত ও উক্ত দু-চারটি কথা উল্লেখ করে বলতে চান যে তিনি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু ঐ অকিঞ্চিৎকর উল্লেখগুলির চেয়ে নীরবতাই তার অধিকতর প্রমাণ। এ কখনও সম্ভব নয় যে এই প্রাণহীন অর্ধমৃত দেশে দুই জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে লক্ষ্যই করেন নি, কিংবা যদি বিরূপতাই পোষণ করতেন তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকত। পরস্পরকে মহৎ ও শ্রদ্ধনীয় জেনেও একমত না হবার মত যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাই এই নীরবতার কারণ। এবং সেই অনৈক্য এত সূক্ষ্ম ও সুকুমার যে তা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে তার উপরে ভর সয় না। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ যে তাই মনে করতেন তা তার নিবেদিতার উপর লেখা প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায়।

নিবেদিতাকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলেন এবং একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে নিবেদিতাকে যিনি জানেন তিনি তাঁর জীবনে তাঁর গুরু প্রভাব ও অবিচল অস্তিত্বকেও জানেন। তবু বিস্ময়ের কথা এই যে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কোথাও রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করেন নি। নিবেদিতার আত্ম-নিবেদন যে নৈর্ব্যক্তিক এক হিন্দুজাতির ভাবধারার কাছে নয়, তা যে একটি বিশেষ ব্যক্তির জীবনস্পর্শে উত্থিত হৃদয়োত্তাপ সুগন্ধ বাষ্পের মত তাঁর চারিদিকের পরিমণ্ডল ব্যাপ্ত করেছিল, এমন হতে পারে না যে কবি তা জানতেন না বা অনুভব করেন নি। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের শত নিরর্থকতার জালে ঘেরা, মানব সম্বন্ধের অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার অথচ গভীর সত্যের খবরই রাখে না, তাদের কাছে তাই সাদা ভাষায় ছাপার অক্ষরে বলতে গেলে অনেক গূঢ় সুন্দর সত্যও স্থূল বোধ হয়; তাৎপর্য ভ্রষ্ট হয়। যে কথা শুধু কবিতায় বলা চলে সে কথা হয়তো গদ্যে প্রবন্ধে বলা চলে না। তা ছাড়া এ যুগের মানুষ যত সহজে মানব সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং করা উচিত মনে করে সে সময়ে তা সম্ভব ছিল না। তাঁরা ছিলেন সমসাময়িক মানুষ, পরস্পরের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অতিক্রম করতে পারতেন না।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে 'সতী' বলেছেন, সতী শব্দের ধাতুগত অর্থ যাই হোক এর ব্যবহারিক অর্থে নৈর্ব্যক্তিক কোন সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বোঝায় না— যেমন দেশপ্রেম জনকল্যাণ ইত্যাদি কর্মের নিষ্ঠাকে সতীত্ব বলে না। সতী শব্দে নারীর কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রেম ভক্তি নিষ্ঠা ও সমগ্র জীবনের আত্মনিবেদন

প্রকাশিত হয়। সতী শব্দের ব্যবহারে তাই রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে নিবেদিতার জীবনে বিবেকানন্দের অবিচল প্রভুত্বের কথাই বলেছেন।

'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থে "নথবতী" আর "মুক্তরূপ" বলে দুটি কবিতা আছে। ওই কবিতা দুটিতে স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত কর্মজীবনের যে কথাটি আছে সে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের বক্তব্যের চেয়ে ভিন্ন। চিত্রাঙ্গদা পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী সহকর্মিণী—উভয়ের কর্মক্ষেত্রও এক। কিন্তু "মুক্তরূপ" কবিতায় নারী তার জীবনের অর্ঘ্য এনেছে পুরুষকেই শক্তি দিতে, তাকে তার নিজের কর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে—সে নারী পথবর্তিনী তরুর মত শুধু ছায়া দিয়ে সন্তাপ হরণ করে না, কঠোরকে মধুর করাই তার একমাত্র করণীয় নয়। সে পুরুষের অজেয় আত্মার রশ্মিতে স্নাত, অকৃপণ মনে কর্মক্ষেত্রে মুক্তি দিচ্ছে, প্রেরণা দিচ্ছে সেই মানবকে যার শৌর্যে 'সূর্যের মহিমা' যে মর্তে 'তিমিরজয়ী প্রভু।' পূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চারণ করবার ক্ষমতার মধ্যে নারীর সার্থক প্রকাশ। আমরা শুনেছিলাম যে এই কবিতাটি লেখবার সময়ে নিবেদিতার জীবনদীপ্ত কবির মনে পড়েছিল। যে দীপ্তি না হলে পুরুষের জীবনের আলো পূর্ণ প্রকাশিত হত না, আর একজনের ভক্তি ভালবাসা ও বিশ্বাসের বহ্নিমুখে উদ্দীপ্ত না হলে সে শক্তি হত না পূর্ণ অভিব্যক্ত।

নারীর এই শক্তিরূপ পুরুষের মুক্তরূপেই সার্থক। ওই কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, বিবেকানন্দ কি বিবেকানন্দ হতেন, যদি না নিবেদিতার আত্মনিবেদন লাভ করতেন? (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) তখন আমরা নানা কথায় বুঝেছিলাম নিবেদিতার জীবনের কী গভীর সার্থকতার রূপ কবির মনে আছে। সন্ন্যাসীর জীবনের সঙ্গে যোগ হল নারীর যে আসক্তি বন্ধনহীন অবারিত আত্মোৎসর্গ তখনকার যুগে এ দেশে তার আর কোন দৃষ্টান্ত কি ছিল? কোন যুগেই এমন ঘটনা বেশী নেই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'মোর রক্ততরঙ্গের মত্তকলরবে বাণী তব মিশে ভেসে যায়।'

বিবেকানন্দ বলে গেলেন কিন্তু নিবেদিতার জীবনে প্রকাশিত রইলেন তাঁর গুরু। এ কথা বলা কঠিন যে বিবেকানন্দ যদি জীবিত থাকতেন তবে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে পথ নিবেদিতা বেছে নিয়েছিলেন সেই পথেই তিনিই অগ্রসর হতেন কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনের পুজা পাঠ ও দরিদ্রনারায়ণের সেবাকর্মই তাঁর একটি মাত্র পথ থাকত কিংবা এ উভয়কেই অতিক্রম করে আরও কোন সত্যতার পথে, উচ্চতর আদর্শে তিনি দেশকে আহ্বান করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পুরুষের বিপুল কার্যোদ্যমের পাশে, রণযাত্রার পথে শ্রদ্ধার পাথেয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নারী—বলছে ঃ

> "আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো.
> মোর দুঃখ যজ্ঞের শিখায়
> জ্বলিবে মশাল তব—"

সেই দুঃখযজ্ঞের আত্মাহুতি কবি দেখেছিলেন। কবির মন সে সতীর তপস্যা ভুলতে পারে নি। বহুকাল পরে লেখা "মহুয়ায়" এই কবিতা স্মৃতির একটি পরিপূর্ণ ছবি।

রবীন্দ্রনাথ 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ' কথাটা নিয়ে অনেক কৌতুক করতেন,

'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটাও তাঁর মনঃপূত ছিল না। নারীকে কামিনী বলা তার একটি বিশেষণ মাত্র, সে বিশেষণ মিথ্যা নয়, কিন্তু খণ্ডিত; নারীর পূর্ণরূপ কি তা নিবেদিতার জীবননাট্যের দর্শকরূপে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন এবং মুখেও বলতেন নিবেদিতার চরিত্রে অপরকে অভিভূত করবার ও স্বমতে চালিত করবার একটি প্রবলতা ছিল তা তাঁর ভাল লাগত না। কবি চিরদিন প্রত্যেক মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দেখতে চাইতেন, স্বাধীন মানুষ যদি তাঁর ভাব গ্রহণ করে তবে ভাল, নইলে জবরদস্তির পথ তাঁর নয়। নিবেদিতার জীবন তাঁর গুরুর মতে সম্পূর্ণ অভিভূত—সেই মতের প্রভাব তাঁর জীবন সীমা পার করে সকলের মধ্যে বিস্তৃত করে দেওয়াই শিষ্যারূপে তাঁর কর্তব্য—'আমার গুরুকে আমি যেমন দেখেছি' তেমনি দেখুক সকলেই। আমাদেরও বিশ্বাস কোন নারীই সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না। যে মুক্তপ্রেমে যে অচলভক্তিতে যে সতীর নিষ্ঠায় তার নারীত্বের পূর্ণরূপ, সেগুলি তার পক্ষে একসঙ্গে মুক্তি এবং বন্ধন। নিজের আত্মায় উদ্বোধিত সেই পরম শক্তিকে নিজের জীবন থেকে অন্যের জীবনে সঞ্চারিত প্রবাহিত করে দিতে পারলে তবেই সে উদ্বোধন সার্থক হয় কিন্তু তাতে একটু জোর লাগে হয়তো। নিবেদিতার হৃদয়োত্থিত যজ্ঞের আগুন থেকে জ্বলে উঠেছিল যে স্বাধীনতা যুদ্ধের মশাল, বিবেকানন্দের প্রবল দেশপ্রেমই তার ইন্ধন ছিল।

একথা আমরা বেদনার সঙ্গে মনে না করে পারি না যে কবির আশ্চর্য সঙ্গীতে জেগেছে যত বেদনা, যত সৌন্দর্য, যত ভক্তি ও প্রেম তা কোথাও এমন দৃঢ়মূল হতে পারল না। সত্যকে জীবন থেকে জীবনান্তরে নিয়ে যাবার যে ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের নিজস্ব একটি রূপ তা রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী কারোর জীবনেই সফল হল না। বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা পান নি এবং পান নি বলেই তাঁর আরব্ধ কর্মগুলির মধ্যে কারও চিত্ত ভাবৈকরসঃ হয়ে নেই। তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কোন জীবন থেকে উত্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ, সেই অজেয় আত্মার রশ্মি, পরবর্তী কালের মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারল না। এ রবীন্দ্রনাথের এবং দেশের একটি বড় ক্ষতি। কিংবা যে যুগ এসেছে এখানে সূক্ষ্ম সুকুমার জীবন—সঙ্গীত 'জাজ' নৃত্যে পরিণত হয়ে যায়। প্রেম ভক্তি ও আত্মদানের পরম দীপ্তিকে ঊর্ধ্বমুখে জ্বালিয়ে তোলা অসম্ভব, তাকে যজ্ঞের শিখা না করে উনুনের আগুন করতে হয়—শুধু অন্ন আর কিছু নয়'—তাই কবির বিজয়-মাল্য থেকে একটি পুষ্প দাবি করতে পারে এমন কোনও কৃতাঞ্জলি এগিয়ে এল না।

আমার বক্তব্য নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে কবির সাধ বিষয়টি অবিশ্বাস্য রকম দুরূহ সেই গভীর অতলস্পর্শ মনের গুহা আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর চারপাশের ক্ষুদ্রমতি আত্মীয়-পরিজনের জানবার সম্ভাবনা কতটুকু? তবু জানতে ইচ্ছা হয় বটে মহৎ লোকের ভাবনার উপর আমাদের দাবী অন্তহীন সে সম্বন্ধে কৌতূহল অপরিমেয়। কবির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর কাব্যের মধ্যেই অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। নাতে এর ওর তার মনগড়া আশা দিয়ে কবির বৃহৎ আশাকে ধারণা করা চলে না। কবির সাধের কথা মনে করলে একটি কবিতা হয়ত সবার আগেই মনে পড়ে সে পূরবীর "আশা"—সে কিন্তু কিছু বৃহৎ দুর্লভ বা "দুরন্ত আশা" নয়...

"কিন্তু যে সব ছোট্ট আশা করুণ অতিশয়, সহজ বটে শুনতে লাগে মোটেই সহজ নয়। একটুকু সুখ গানের সুরে ফুলের গন্ধে মেশা গাছের ছায়ায় স্বপ্ন দেখা অবকাশের নেশা, মনে ভাবি চাইলে পাবো, যখন তারে চাহি তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনখানেই নাহি। এই দুষ্প্রাপ্য সুখটি কি?

বহুদিন মনে ছিল আশা, ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে ধন নয় মান নয় একটুকু বাসা...করেছিনু আশা গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা, ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা, চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে, ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে। তাহারে জড়ায়ে ঘিরে গড়িয়া তুলিব ধীরে, জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা করেছিনু আশা।

এ আশা মেটান সহজ হয় নি এ সাধ পূর্ণ হলনা, চেষ্টা করেছেন সফল হন নি সে কথা কিছুদিন পরে আর একটি কবিতায় স্বীকার করে গেছেন।

আমরা সকলেই জানি কবি চিরদিন ছোট ঘর ভালবাসতেন - রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকাতে জন্মগ্রহণ করলেও ইঁট কাঠ পাথরের বন্ধন ছাড়িয়ে তার মন ছুটেছে প্রান্তরের দিকে, প্রকৃতির নিরাবরণ সৌন্দর্যের মাঝখানে যেখানে পদ্মার দুই তীরের স্বর্ণবালুর চর মিশেছে দিগন্তে -ঠিক যতটুক গৃহাশ্রয় নিতান্ত প্রয়োজন তার বেশী তিনি চান নি। পঁচিশ ত্রিশ বছরের পূর্ণ যৌবনে পদ্মায় ভাসমান তাঁর ছোট নৌকা "পদ্মায়" যে ঘরে দিনের পর দিন চলেছে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলনোৎসব সে ঘরে দীর্ঘাকৃতি মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ান কঠিন। জমিদারীর কাজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভেসে চলেছে নৌকা, কবি দেখছেন বাংলাদেশের শত শত নরনারীর সুখ দুঃখ গাঁথা বড় আদরের বড় কষ্টের সংসার খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরে জীবন খেলা, সেই "হাল লাঙল গরু গোয়ালঅলা" মানুষের পরমাত্মীয় এই মানুষের কবির কাছে প্রাসাদ হর্ম্য তার সমস্ত মোহ হারিয়ে ফেলেছে—যখন শান্তি-নিকেতনের মরু প্রান্তরের মধ্যে কবি তার বৃহৎ সংসারের গার্হস্থ্য শুরু করেন তখনকার বাড়িগুলি অধিকাংশই ছিল খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। স্বল্প পরিসর, আসবাবশূন্য।—'দেহলীর' একখানি দশ হাত পরিমিত ছোট ঘরে বসে দূর-

দূরান্তরের বিচিত্র মানব জগতের অভিমুখে কখনো বা বিশ্বচরাচরের দিকে উৎসারিত করেছেন অনন্ত সঙ্গীত। সে সঙ্গীত জগতের লোককে ডাক দিয়ে এনেছে যে আশ্রমের প্রাঙ্গণে, সে আশ্রম আজকের মত ইমারতে গাঁথা নয়। ১৯১৪ সালে একটি বিদেশী কবির ছোট্ট ঘরখানির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন তাঁর বস্তুভার হীন পরিচ্ছন্নতার কথা—ঘরটুকুতে মাটিতে সতরঞ্চি বিছান। লেখবার সরঞ্জাম সর্বসমেত যা আসবাব তার মূল্য দশ বারো টাকার বেশী নয়। গাছের তলে প্রকৃতির মাঝখানে বসিয়েছেন ছেলেদের মাটির ঘরের স্নিগ্ধতায় যোগ করেছেন সৌন্দর্যের মূল্য। তিনি বিরাট প্রাসাদে বাস করতে ভালবাসতেন না কিন্তু তাই বলে সুন্দর ঘর ভালবাসতেন না তা নয়—বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগ্রহ হয়েছে বেড়ার বুননি, খড়ের চালের নমুনা, আলপনার নকশা—আজ যে শহরের উৎসবের তোরণে কুটিরের আভাস দেওয়া হয় এ সমস্তই সূত্রপাত হয়েছে শান্তি-নিকেতনে বা শিল্পের নন্দনভূমিতে। অর্থমূল্যকে অতিক্রম করে মাটির কুটির পেয়েছে অমূল্যের ছাপ এমন একটি কুটির তালধ্বজ। একটি তালগাছকে বেষ্টন করে গৃহ ও প্রকৃতির মেশামেশি হয়ে রয়েছে কোনো স্কাইস্ক্রেপার কোনো মর্মর হর্ম্যের কাছে সে লজ্জা পাবে না। তার দিকে চেয়ে ধনীর দম্ভের দেওয়ালে ফাটল ধরবে—মনের কোনে ঈষৎ আকর্ষণ রোধ করতে পারবে না—হয়ত বা তার মনের মধ্যে তেমনি একটি অব্যক্ত ভাব জেগে উঠবে যেমন হয়েছিল ভিক্ষু অনাথ পিণ্ডদের আহ্বান শুনে "রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন, গৃহীভাবে মিছে তুচ্ছ আয়োজন, অশ্রু অকারণে করে বিসর্জন বালিকা।...কিন্তু সেই লঘুবাস্তবতার সৌন্দর্যমূর্তি গৃহ বৈরাগ্যের শুষ্কতা নয়। সৌন্দর্যের চির অতৃপ্ততারই স্পর্শ আনে। কবি এমনি একটি আবাস তৈরী করতে চেয়েছিলেন সেই অপূর্ণ সাধের অতৃপ্ত প্রেরণাই তাঁকে বার বার নানা ছোট ছোট ঘর তৈরীর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত করেছে। বিশেষত ক্রমে ক্রমে যখন উদয়ন প্রাসাদ গড়ে উঠল, তখন সে প্রাসাদ তাঁকে প্রায় গৃহছাড়া করে তুলল'—একথা আজ বলে রাখা আবশ্যক যে উদয়ন প্রাসাদ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায় নি। ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে তিনি তাকে "রাজবাড়ি" বলে উল্লেখ করতেন, কখনো বা বলতেন 'স্পর্দ্ধা', আশ্রমের গুরুপল্লীর খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরের পাশে তাকে স্পর্দ্ধা মনে হলেও শিল্পের উৎকর্ষে তা মূল্যবান। পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় স্থাপত্যের বিস্ময়কর কীর্তি তবুও কবির মন সায় দেয় নি, কারণ সে শিল্প যে শিল্পীর সত্ত্বাধিকারে বেড়া অতিক্রম করে সকলের হয়ে উঠতে পারে নি। উত্তরায়ণের মধ্যে বাড়িগুলি 'রবি' অর্থাৎ সূর্যের সঙ্গে সংযুক্ত—আশ্রমের উত্তর প্রান্তে কবির প্রথম বাসস্থানটি বোধহয় ছিল কোণার্ক ও শ্যামলীর মাঝখানে স্থিত একটি মাটির খড়ে ছাওয়া ঘরে। ১৯২৬ সালে কবি যখন কোণার্কতে বাস করতে এলেন তখন সেই মাটির ঘরে অমিয় চক্রবর্তী বিদেশিনী পত্নীকে নিয়ে নূতন সংসার পেতেছেন। কোণার্কের সামনের আজকের প্রকাণ্ড শিমূল গাছটি তখনও শিশুতরু চারিদিকে আশ্রমের স্নিগ্ধতা—গুরু পল্লীর মাটির ঘরগুলি থেকে তখনও রবীন্দ্রনাথের বাসস্থানের পার্থক্য লক্ষ্য হয় শুধু পরিচ্ছন্নতায়, সম্পদে নয়—সেই সময়ে যারা হঠাৎ কোনো সমৃদ্ধ শহর থেকে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে তারাই বলতে পারে তখন তাদের মনে কী বিস্ময় কী অভিভূত সৌন্দর্যানুভূতি ও শ্রদ্ধা সামান্যের সঙ্গে

অসামান্যের এই আশ্চর্য সংযোগে জেগে উঠেছে। কোণার্কের ছোট ঘরগুলি কিংবা পরবর্তী কালের 'শ্যামলী' ও 'পুনশ্চ'র অপবিসর ঘরগুলি 'শালপ্রাংশু মহাভুজ' বা ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ দেহের পরিমাপে সঙ্কীর্ণ তাতে সন্দেহ নেই, শান্তিনিকেতনের গ্রীষ্মতপ্ত আবহাওয়ায় আরাম প্রদত্ত নয় কিন্তু শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করবার শক্তি তার ছিল অসাধারণ, সেই স্বল্প পরিসর স্থানে যেখানে দাঁড়ালে মাথায় ছাত ঠেকে যায় সেখানে সেই আদর্শ পুরুষের উপস্থিতিই মাটির ঘরকে রাজ মহিমায় পূর্ণ করে দিত।

তারপর ক্রমে ক্রমে 'উদয়ন' প্রাসাদ তার মহিমা বিস্তার করলে, মরু প্রান্তরে বাগান হল পুষ্প শোভিত। ঝিলে ভাসল মরাল, সামনের গোলাপ বাগান পারস্যের শাহী সুগন্ধ বিকীর্ণ করল—কবির মন বল্লে, 'হল না মিটল না, আমার সাধ—'ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা করেছিনু আশা—কেন? সৌন্দর্যের উপাসক কবি তো বৈরাগ্য সাধক নন—'যা কিছু আনন্দ আছে রূপে গন্ধে গানে তিনি তো তারই সন্ধানে ফেরেন তবে? তিনি রূপ সাগরে ডুব দিয়েছেন বটে কিন্তু সে তো অরূপ রতন আশা করে—রূপকে অহং থেকে মুক্ত করে অরূপ করে নিতে তিনি চান। গোলাপ বাগানের ভ্রমরের গুনগুনানি তাঁর কাব্যে প্রবেশ করতে চায় তবু সংশয় থাকে ঐ গোলাপ কেন লাইব্রেরীর সামনে ফুটল না, কেন ফুটল না এমন জায়গায় যেখানে সকলের দাবী পেঁছিত।

'মানুষের ধর্মের' লেখক নব যুগের বাণীর মহত্তম বাহক কবি আশ্রমের প্রাঙ্গণে ব্যক্তিগত সত্ত্বাধিকারের শীলমোহরের লাঞ্ছনায় কেবলই ক্ষুব্ধ হলেন। এ ক্ষোভের কথা যারা জানেন তাঁরা আজও অনেকেই জীবিত আছেন। উদয়নের প্রতিস্পর্ধী আর একটি গৃহ তৈরী হলে তার নামকরণ শুনে কবি সহাস্যে বলেছিলেন ওটা ভুল নাম হওয়া উচিত ছিল প্রত্যুত্তরায়ণ—এই কৌতুক চিহ্নিত সংশোধনের মধ্যে আশাভঙ্গের করুণ সুর শুনতে পাবেন এমন অনেকেই আছেন। 'প্রত্যুত্তরায়ণ' উত্তর হলেই প্রত্যুত্তর—এমনি করে ক্রম বর্দ্ধমান বহুবিধ সমস্যা ও মানুষের ভীড়ে উত্তর প্রত্যুত্তরের জটিলতায় পথভ্রষ্ট সাধকে খুঁজে ফেরেন কবি। তখন উঠল শ্যামলী মাটির বাড়ি—তিনি বলতেন মাটির ঘরে থাকতে আবার কষ্ট কী। ভারতবর্ষের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই তো মাটির বাড়ীতে থাকে আমিও তেমনি মাটির ঘরে মুড়ি-টুড়ি খেয়ে থাকব। সেই সহজ সরল জীবনে ফিরে যেতে চাই যেমন করে আরম্ভ করেছিলাম। আমার আশ্রমের মাঝখানে রাজপ্রাসাদ অশোভন, unfair স্পর্দ্ধিত তর্ক করেছে কেউ কেউ—তাই যদি হবে তবে উঠল কেন রাজপ্রাসাদ, বন্ধ করলেন না কেন প্রথমেই, জোর করে বললেন না কেন আপনার বক্তব্য যেমন গান্ধিজী করেন? যিনি কবি সারা জীবন ধরে বলাই যাঁর কাজ এই মূঢ় প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দেবেন? বলিনি কি? আমার যা বক্তব্য তা এই দীর্ঘ আশী বছর ধরে কি বলি নি? তোমরা যদি শুনতে না পাও সে কি আমার দোষ, আমি তো বলে চলেছি আমার সারা জীবনের সাধনা দিয়ে সমস্ত কবিত্বের শক্তি দিয়ে জবরদস্তির ভাষা তো আমার নয়। আজ যখন চতুর্দিকেই দেখি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠানের আগেই বাড়ি তৈরী হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে ইমারত পাষাণ হর্ম্য তখন মনে পড়ে গাছতলায় যিনি প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন তাঁর জানা ছিল আগে প্রতিষ্ঠান তবে তার প্রতিষ্ঠা গৃহ আগে প্রাণ

তারপরে নীড়, নীড়ের চাপে প্রাণটা যে পালাতে চায় তাইত শহরের বন্ধন ছেড়ে এসেছিলেন প্রকৃতির মাঝখানে। কিন্তু শহর তাঁকে তাড়া করে এল। তার দুর্ধর্ষ বাহু বিস্তার করে যুগধর্মের প্রবল অভিঘাতে আশ্রমগৃহের সামনে কোলাপ্‌সেবল গেট বসল সেই ছোট্ট আশা বা সাধ গেল চূর্ণ হয়ে—একথা আজ কারু মুখের সাক্ষ্যে যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয় তবে কুটীরবাসী কবিতাটিতে আছে সেই সাধের পূর্ণতম অভিব্যক্তিরূপ।

তোমার কুটীরের সমুখ বাটে, পল্লী রমণীরা চলেছে হাটে। উড়েছে রাঙা ধূলি, উঠেছে হাসি উদাসী বিরাগীর চলার বাঁশি, আঁধারে আলোকেতে সকালে সাঁঝে, পথের বাতাসের বুকেতে বাজে যা কিছু আসে যায় মাটির' পরে পরশ লাগে তারি তোমার ঘরে। ঘাসের কাঁপা লাগে, পাতার দেশে শরতে কাশবনে তুফান তোলা—

তোমারি মত তব কুটির খানি
স্নিগ্ধ ছায়া তার বশে না বাণী!
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতা ক'টি আলোয় নাচে।…
সমুখে খোলা মাঠ করিছে ধূ ধূ
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে খেজুর শুধু
তোমার গলাখানি আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে কাকের ঝুঁটি…
দেখি যে পথিকের মতই তাকে
থাকা ও না থাকার সীমায় থাকে
ফুলের মতো ও যে পাতার মতো .
যখন রেখে যাবে, যাবে না ক্ষত।
নাইকো রেষারেষি পথে ও ঘরে
তাহারা মেশামেশি সহজে করে
কীর্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি
হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে—

বিচার

সাম্য ও মানবিক অধিকারের কথা আজকাল খুব আলোচনা হয়। প্রত্যেক মানুষের কতগুলি ন্যায্য অধিকার আছে যার থেকে তাকে বঞ্চিত করলে সমাজের ভিত্তিই নড়ে যায়। তার মধ্যে প্রথম এবং প্রধান তার বাঁচার অধিকার। এই অধিকার পদে পদে লাঞ্ছিত হচ্ছে।

পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে। প্রথম বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্ব তৃতীয় বিশ্ব—এই ভাগ সম্ভবত ধন ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে হয়ে থাকবে।

কারণ আজকের জগতে ধনই সভ্যতার মাপকাঠি। তাই এ ভাগ অন্যভাবেও বলা যায় সভ্যতম সভ্যতর ও অসভ্য বিশ্ব। কিন্তু মানুষের যে প্রধান অধিকার তার প্রাণরক্ষা—এ অধিকার থেকে সে এই তিন বিশ্বেই অনবরত বঞ্চিত হচ্ছে। গত বৎসর নাকি দশলক্ষ মানুষ এই অধিকারে বঞ্চিত হয়েছে—তাদের মারা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। আজ ইরাণ ও আফ্রিকায় নৃসংশতার চূড়ান্ত তাণ্ডব আমরা দেখছি। অবশ্য প্রথম বিশ্বের অধিবাসী সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠেও জার্মানীরা কম নৃশংসতা দেখায় নি। আজ নিউক্লিয়ার বোমা তৈরী হচ্ছে সুসভ্য দেশেই। কত দ্রুত কত নিষ্ঠুরভাবে কত বেশি মানুষ ধ্বংস করা যায় তারই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা ও তাদের ক্রীতদাস বৈজ্ঞানিকরা। বৈজ্ঞানিকরা সত্যানুসন্ধান করছেন তাদের সাধনা মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত বাড়িয়ে দিচ্ছে একথা ঠিক। নূতন নূতন আবিষ্কাব তাঁরা করবেন ঠিকই কিন্তু মানুষের বিদ্যা যেমন বাড়ে প্রজ্ঞা যদি সেই সমতালে গভীর না হয় তবে এ বিদ্যা জগতের ভারসাম্য রাখতে পারবে না। বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বাঁদরের হাতে পড়বে তারপর সে বোতাম টেপার খেলা করতে করতে কখনো ভুল বোতামটি টিপে দেবে। এসব কথা সবাই জানে। আলোচনা হয়, কোনো ফল হয় না। প্রথম বিশ্বের বিদ্যা অর্থ বুদ্ধি কৌশল সবই আছে নেই শুধু প্রজ্ঞা (wisdom) সেটার অভাবই সর্বনাশা।

অপর দিকে ইরাণের ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলি আফ্রিকার দেশগুলির দিকে তাকালে মনে হয় নরহত্যার বীভৎসতা পশুজগৎকে অনেক গুণে ছাড়িয়ে গেছে। ইরাণ আজকের defination অনুসারে কোন বিশ্বে পড়ে তা জানি না কিন্তু ইরাণের সভ্যতা আজকের নয়—তুরস্কে কামাল পাশা মেয়েদের সুখের ঘোমটা খুলে দিলেন আশা করা গিয়েছিল ক্রমে সমস্ত মুসলমান সমাজে নারীমুক্তির জোয়ার আসবে। এল না। এখন মধ্য এশিয়ার দেশগুলি তেলকূপের উপর বসে টেলিভিশন দেখছে—মারসেডিস্ চালাচ্ছে। কিন্তু অন্তরে আরো বেশি পশ্চাৎ-মুখী হয়েছে। শিক্ষার সাম্য নেই বলেই এমনটি ঘটতে পেরেছে। টাকার জোরে আধুনিক সুখ-সুবিধা কিনে নিয়েছে বটে কিন্তু অন্তরের দিক থেকে যুক্তি প্রয়োগ করতে শেখেনি সহস্র বছর আগের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আজকে যখন পৃথিবীর মানুষ প্রযুক্তি বিদ্যার কৌশল প্রয়োগে এত কাছাকাছি আসতে পারছে তখন সভ্যতার মধ্যে চিন্তাধারার মধ্যে সংস্কৃতির মধ্যে এত পার্থক্য বিপদেরই কারণ। যখন একটা দেশের মধ্যে স্ত্রী পুরুষেরই অধিকারের পার্থক্য এতখানি তখন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মিলবে কি করে? মাঝে মাঝে আমরা শুনি রুশ দেশে কোন কোন কবি স্বাধীনভাবে লিখতে পারেনি মানবিক অধিকারের এই ব্যাতয়ে পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা আকুল হয়ে ওঠে। হয়ত বা রুশ লেখকের সেই অপাঠ্য বইকে নোবেল প্রাইজ ধরিয়ে দিয়ে তার অধিকার রক্ষণ করে কিন্তু এদিকে ইসলামিক দেশগুলিতে হাত পা কেটে ফেলা হচ্ছে মানুষকে অর্ধপ্রোথিত করে পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছে এই অমানবিক ভয়ানক ব্যাপারেও প্রথম বিশ্ব প্রায় নীরব। কবিতা লেখা হল না বলে যারা অস্থির, যে হাতটি কেটে ফেললে লেখা চিরতরে বন্ধ হয় সেই লেখাটির জন্য কেউ ব্যাকুল নয়। আমেরিকায় অন্তত কেউ ব্যাকুল হয় নি -কারণ ওখানে তেল আছে। তেলের রাজ্যে তেল মানবিক অধিকারের চেয়ে বড়।

ইরাণের এই ঘটনা যে অন্যদেশেও আবহাওয়া বিষাক্ত করবে তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত যে দেশে মুসলমান আছেন। আমাদের দেশের বহু তথাকথিত শিক্ষিত মুসলমানকে বলতে শুনেছি—হাত পা কাটা তো ভালই, ইসলামের এই নীতি পালন করলে চুরি ডাকাতি বন্ধ হয়, নারী ব্যাভিচারিণী হয় না। তারা একথা ভেবে দেখেন না এই ধরনের অত্যাচার করবার অধিকার কার আছে? কে সম্পূর্ণ সাধু—যেমন সুসভ্য দেশের পুলিশী যন্ত্র মানুষের উপর রাজনৈতিক কারণে অত্যাচার চালাবার সময় চিন্তা করে না এ অধিকার সে কোথা থেকে পেয়েছে।

মত পার্থক্য, স্বার্থ ও সংস্কৃতির পার্থক্য দিন দিন যদি বেড়েই চলে তাহলে মানুষের জগৎ ক্রমেই বিভক্ত খণ্ড খণ্ড হয়ে হানাহানি করবে।

বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে যেমন তেমন একটি দেশের মধ্যেও সংস্কৃতির ঐক্যর দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ না করলে সমাজ চুরমার হয়ে যায়।

আমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধরা যাক এক অন্ন খেয়ে এক ভাষা বলে পাশাপাশি বাস করেও হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব ঘুচল না। আমরা অনেক সময় মনে করেছি শিক্ষার অভাবই এর কারণ কিন্তু সুসভ্য আয়ারল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে সে কথা আর মনে করতে পারছি না।

যেহেতু পরের দেশের উপর আমাদের কোনো হাত নেই, সেখানকার হিতাহিত বিধান করবার আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই তখন নিজের দেশের কথাই ভাবা যাক —এই একটা দেশের মধ্যেও কত বিশ্ব তৈরী হচ্ছে হিন্দু—মুসলমানের দুরকম আইন করে দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক জীবনের সমতা নষ্ট করা হয়েছে। হিন্দু মেয়েদের যে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে মুসলমান মেয়েদের হয় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভেদটাই মারাত্মক। নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় হয়েছে নানা বিশ্বের উপযুক্ত। উচ্চ বিলাতী স্কুল থেকে যারা পাশ করে বেরুল ও দেশী ও অবৈতনিক স্কুল থেকে যারা পাশ করল এদের দৃষ্টিভঙ্গী, বিদ্যা, সংস্কৃতি সমস্তই পৃথক। দুরকম ব্যবস্থারই দোষগুণ আছে—কিন্তু গুণগুলো বেছে নিয়ে একরকম সুষম শিক্ষা ব্যবস্থা কি চালান যায় না? অন্য দেশে হয়েছে। চীনে সব বিদ্যালয়েরই এক মান। এখানে শিক্ষার দ্বারা দেশের ছেলে-মেয়েদের বিদেশী করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘটছে আকাশ পাতাল বৈষম্য। সবাই মিলে একটা দেশ গড়তে গেলে যে ঐক্য দরকার শিক্ষার ক্ষেত্রেই তা চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ এই দেশে আজ সবচেয়ে ভ্রষ্ট ধর্ম। পুজার তাণ্ডবে সে কথা প্রতিবার নূতন করে মনে পড়ায়। ধর্মের পরীক্ষা মানুষের ব্যবহারে আর চরিত্রে—কোনো পুজোর মণ্ডপে দাঁড়িয়ে মনে হয় না যে এদেশে ধর্ম-ভাবনা যে অন্তরাত্মার জিনিস তা কারু মনে আছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপুল বৈষম্য তো আছেই কিন্তু কোনো খানেই সুস্থ সংস্কৃতি চেতনা লক্ষ্য হচ্ছে না, কোনো সুন্দর মূল্যবোধ। ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ নয় আজকের পুজো বা দৈনন্দিন জীবন।

সংস্কৃতির এই বিচ্ছিন্নতা জনজীবনকে বিচ্ছিন্ন করছে শিক্ষার বৈষম্যই তাঁর মূলে।

সবচেয়ে যেখানে মানুষের অধিকার লাঞ্ছিত সে বিচারালয়। দামী উকীল ও

নামী উকীলের উপর যেখানে বিচার নির্ভর করে সেখানে দরিদ্র কি করে সুবিধা পাবে?

আইনব্যবসায়ীরা রাতকে দিন দিনকে রাত করে দিচ্ছে এবং সে একাজে যত দড় তার তেমনটি মূল্য। আমরা সুবিচার পাচ্ছি না অবিচার কিনছি টাকা দিয়ে। আইনব্যবসায়ীদের কাজ হোক সত্যকে উচ্চারণ করা দোষীকে নির্দোষ ও নির্দোষীকে দোষী করা নয়।

আজকে আমরা একত্র হয়েছি কোনো নূতন উচ্চবাণী বলবার জন্য নয়—সাদা সহজ সরল সত্যগুলি যা বর্তমানে সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তনে হারিয়ে গেল তারই উদ্ধারের জন্য।

সঙ্গীত ও পূজা

ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন হল যার প্রধান উপাচার সঙ্গীত। মনুশাসিত ভারতে এবং সম্ভবত ইসলামের প্রভাবে নৃত্যগীত তার পূর্বে একেবারেই সুনজরে দেখা হত না। যদিও দক্ষিণ ভারতে সর্বত্রই বাদ্য সহযোগে দেবদাসীরা পূজা নিবেদন করতেন। সোমনাথের মন্দিরে এক হাজার দেবদাসী ভগবান সোমনাথের আরাধনা করতেন।

মূর্তি উপাসক ভারতের আবির্ভাবের পূর্বে বৈদিক ভারতে ঋষিরা প্রকৃতির উপাসনা করতেন—বিশ্বচরাচরে গ্রহনক্ষত্রে ঋতুতে ঋতুতে পুষ্প পত্র বিকাশে সন্ধ্যা ও ঊষার বিচিত্র রঙ্গের খেলায় তাঁরা অভিভূত হতেন যেমন অভিভূত হয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বড় বিস্ময় মানি হেরি তোমারে"—সৃষ্টি-কর্তা তাঁর সৃষ্ট রূপের মধ্যে যে অপরূপ ভাবে প্রকাশিত হচ্ছেন তা দেখে দেখে যুগে যুগে মানুষ গানে গানে সাড়া দিয়েছে তার বিস্ময় কথার সীমিত অর্থে ব্যক্ত হতে চায় না। বৈদিক কবিরা কবিতা লিখেছেন, সেই ঋক মন্ত্রগুলি গান করেছেন—বেদ গানের ধ্বনিতে বনভূমি মর্মরিত হয়েছে। তা কান থেকে কানে মন থেকে মনে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে এল। পরবর্তী যুগে যখন পৌরাণিক কাহিনীগুলি এদেশের আদিম প্রচলিত কাহিনীগুলির সঙ্গে মিশে নানা মূর্তিতে রূপ নিল, তখন পূজা হয়ে গেল সংকীর্ণ মন্দিরের চৌহদ্দিতে আবদ্ধ, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে, বিশেষ বিশেষ উপাচারে নির্দিষ্ট গন্ডী বদ্ধ। কিন্তু সাধকের মন তো আবদ্ধ থাকে না। সে ক্রমাগত নিজের সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায় নিজেকে উৎসারিত করতে চায় কোনো এক অজানার দিকে, কোনো অজ্ঞাত লোকের অভিমুখে, কোনো এক অলোকসম্ভব ভালোবাসায় যার সম্পূর্ণ অর্থ তার নিজেরও জানা নেই। নির্দিষ্ট কতগুলি বহুউচ্চারিত মন্ত্র তখন তাকে আর সেই অসীম আনন্দের বোধ দিতে পারে না। তখন রামপ্রসাদ শ্যামা সঙ্গীত গান করেন—গান করতে করতে যে রসে তিনি শ্যামার মূর্তিকে সঞ্জীবিত করেন, সে চন্ডী মন্ডপের পাঁঠা খাওয়া শ্যামা নয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি লাইন আছে—'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব নাগো গান দিয়ে দ্বার খোলাব।' এ লাইনটি একাধিক অর্থে সত্য। গান দিয়ে যা করা যায় হাত দিয়ে বা তথা যুক্তিতর্ক দিয়ে, তা করা যায় না। আমরা দেখি যখনই কোনো কঠিন কাজে আমরা ব্রতী হই গান আমাদের শক্তি দেয়—গান অস্ত্রের চেয়েও

শক্তিশালী। যে দেওয়াল মন্ত্রে ভিন্ন হয় না গানে তা চুরমার হয়ে যায়। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে অসম সাহসে মীরাবাই গান গেয়েছিলেন—"তুলসী পূজনে হরি মিলে তো পূজে তুলসী ঝাড়, পাথর পূজনে হরি মিলেতো মৈ পূজে পাহাড়।'

উপকরণ যে অনাবশ্যক সে যুগে তা বক্তৃতা করে বলে কেউ পার পেত না। কবীর নানক দাদু সবাই তাই ছন্দেই তাঁদের কথা বললেন—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠিন বন্ধন ছিঁড়ে জাতপাতের বেড়া ডিঙ্গিতে তারা যে পথে বেরিয়ে পড়লেন সে পথ গানে গানে মুখর। আর তাই বিরুদ্ধতা দূর হয়ে "লোক নাহি ধরে যবন নোলার চরণধূলার লাগি"—!

তারপর এলেন চৈতন্যদেব—। হিন্দু সমাজের অঙ্গচ্ছেদ না করে কৃষ্ণ পূজক শ্রীচৈতন্য মানব প্রেমের এক নূতন বাণী নিয়ে এলেন। জাতের গন্ডী গেল ভেঙ্গে, নারী পেল মুক্তি—বিধবার শূন্য জীবনে এল প্রেমের সঞ্জিবনী শক্তি—যে দেশে যে সমাজে বিধবাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত সে দেশে কণ্ঠীবদল করে পুনর্বিবাহিতা নারী মাথা উঁচু করে চলবার জোর পেল। এই যে বিপুল পরিবর্তন ঘটল কীর্তনের মন্ত্র শক্তিই তার একটি প্রধান কারণ। নদিয়ার নিমাই রাস্তা দিয়ে কীর্তন গেয়ে যেতেন শত শত লোক পথে বেরিয়ে পড়ত তথা কথিত জাত কুল খুইয়ে যবন ব্রাহ্মণ হাতে হাতে ধরে কৃষ্ণনাম কণ্ঠে নিয়ে। গান এখানে বহু যুক্তিতর্কের চেয়েও সহজে মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়েছে—সমস্ত ধর্মেরই যা উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের পরে যে পরিবর্তনের শুরু হল—সমুদ্র যাত্রার নিষেধ অগ্রাহ্য করে—যখন বাঙালীর ছেলে পশ্চিমের সভ্যতার খোলা বাতাস নিশ্বাস নিল, ছোঁয়াছুঁয়ি "ভাতের হাড়ির ধর্ম" ফেলে কুসংস্কারের গন্ডী ভেঙ্গে মানুষের হৃদয়স্থিত ধর্ম বাসনার স্বরূপ কি তা তখন আর একবার চিন্তা করবার সময় এল।

সংঘবদ্ধভাবে সেই চেষ্টার প্রয়াসেই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম—ব্রাহ্মসমাজ কোনো নূতন ধর্ম প্রবর্তন করে নি—প্রাচীন উপনিষদের বিশ্ব ভাবনার ভেতরে অবগাহন করে নূতন যুগের সঙ্গে সঙ্গত এক উপাসনা রীতি উদ্ভাবন করেছিল। উপনিষদের ঋষিরা পৌত্তলিক ছিলেন না—যে সমস্ত জিজ্ঞাসা স্বতই মানুষের মনে আসে, যে অপার বিস্ময়ে এই বিশ্বচরাচরের রূপলীলা মানুষকে অভিভূত করে জীবন মৃত্যুর রহস্যময় খেলায় যে অসীমের সংবাদ আনে, সৃষ্টির আনন্দে যে স্রষ্টার স্পর্শ পাওয়া যায় তারই উপর নির্ভর করে বিশ্ব বিধাতার যে ভাবরূপ তাঁদের মনে রূপ নিয়েছিল সে বিধাতা আপনি পাদো। তিনি অচক্ষু এবং অকর্ণ তবু তিনি আছেন বলেই আমাদের গতি আছে আমরা দেখতে পাই আমরা শুনতে পাই—আমাদের জীবন আছে। প্রাণ বায়ুতে প্রবিষ্ট স্রষ্টার সেই সত্তা তাঁদের উপলব্ধির মধ্যে সত্য, কোনো মন্দিরে মূর্তিতে কাঠে পাথরে তাঁকে খোঁজেন নি তারা।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম সঙ্গীত বা পূজার সঙ্গীতগুলি যখন শুনি তখন মনে হয় এও তো সেই বৈদিক ঋষিদের মত প্রকৃতির বন্দনা কেবল এর ভাষা আলাদা।

আকাশে ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান—
কিংবা আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে

তোমার বিরাম হারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে
তেমনি করে শুধা সাগর সন্ধানে
আমার জীবন ধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?

এমনি শত শত গানে পূজা প্রকৃতি ও প্রেম মেলামেশি করে এক অপরূপ ভাবে ভাবিত করছে মানুষের মন। বিশ্ব চরাচরে যে আশ্চর্য বার্তা বহন করে আসছে তা সব মানুষের মনকেই কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে অজ্ঞাত গভীরের দিকে টানে। তার মনে প্রশ্ন জাগে এর নিয়ন্তা কে ? একজন তেমনি ব্রহ্মোপাসক নির্মল চরণ বড়াল লিখেছেন ঃ—

ভুবন ভরিয়া জীবন ছাড়িয়া কে তুমি, কে তুমি—
ভুলোক দ্যুলোক পূর্ণ করিয়া কে তুমি, কে তুমি ?
এদেহ বীণায় তুলি নানা সুর কে তুমি বাজাও অতি সুমধুর
রূপে রসে রঙ্গে ভরি হৃদিপুর কে তুমি কে তুমি ?

কিংবা উপেন্দ্র কিশোর রায় রচিত

বল দেখি ভাই এমন করে ভুবন কেবা গড়িল রে
গগন ভরে তারার মাণিক ছড়ায়ে কে রাখিল রে।

ইত্যাদি অনেক ব্রহ্ম সঙ্গীতই বিস্ময়াভিভূত মানুষের প্রশ্ন এবং উপলব্ধির আনন্দ প্রকাশ করছে। কিসের উপলব্ধি ? ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করে কার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, না সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে, না স্রষ্টার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে ? তা নয়, কোনো দর্শন তত্ত্ব নয়, কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের গন্ডী বন্ধন নয়—হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়ে যে সব অধরা অলোক সম্ভব ভাবনা মানুষী সত্ত্বার একটি বিশেষ সত্য সেই সত্ত্বাকে উপলব্ধি করেছে—। ব্রহ্ম সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে সেই এক আনন্দময় প্রেমময় জগতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রয়োগ করলে তুচ্ছ বিভেদের গন্ডী মিলিয়ে যায়—মানুষ তার উপলব্ধির রসায়নে জারিত করে যে দেবতাকে পায় সে দেবতা মানুষের দেবতা—মানুষের হৃদয়েই তাঁর জন্ম। তাঁর জন্য কোনো আলাদা স্বর্গ নেই। সুরের সপ্ত পক্ষে ভক্ত বাহিত হয়ে তিনি আসেন তাঁকেই সম্বোধন করে কবি গান করেন আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।

তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ? জীবন বোধের মধ্যেই এই জীবনাতীতের স্পর্শ পাওয়ায় মানুষের পূর্ণতা। ব্রহ্ম সঙ্গীতের রসধারায় এই অপূর্ণ তাপিত ক্লিষ্ট মানুষ তার হৃদয় নন্দন বনেই পূর্ণের পদ পরস্ব লাভ করে।

পুজা

আজকাল ভারি একটা তামাসা হয়েছে যে মানুষ নিজে যে কাজ করে নিজেই তাতে বিশ্বাস করে না। অথচ বহু কষ্ট হাঙ্গামা করে সেই অনর্থক কাজের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করে। এর একটি বড় উদাহরণ আজকের পুজা পদ্ধতি। শক্তি পূজার প্রধান অর্থই শক্তি, বীর্য, সামর্থ্য, প্রার্থনা কিন্তু শত করা একজন লোকও বিশ্বাস করে না যে দশভূজার মূর্তিতে অঞ্জলি দিলে শত্রু নাশ হবে বা বিত্ত লাভ

হবে। তাহলে'তো সরস্বতী পূজো করেই বিদ্যা লাভ হতো। তার জন্য আর স্কুল-কলেজে সময় নষ্ট করতে হত না। আর বিশ্বকর্মা পূজোর যা ঘটা দেখা গেল তাতে মনে হয় প্লানিং কমিশন আর বসাবার দরকার নেই—বিশ্বকর্মার প্রসাদেই আপনা-আপনি ষ্টীল প্ল্যাণ্ট গজিয়ে উঠবে। সকলেই জানে যে সব দেশে বিশ্বকর্মার অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়েছে তারা ও দেবতাটির পূজো অন্যভাবেই করেছে। অথচ এর একটি কোন অনুষ্ঠান বন্ধ করতে চান ধর্মে হাত পড়ল বলে সারা দেশ হৈ-হৈ করে ক্ষেপে উঠবে। পেটে হাত পড়লেও তত মাথা গরম হয় না যত রাগ হয় ধর্মে হাত পড়লে যে ধর্মে কারো আদৌ এক রতি বিশ্বাস নেই। অথচ ভাতে তো বিশ্বাস আছে সেটা না পেলে কি হয় তা তো প্রত্যক্ষভাবে টের পেতে দেরী হয় না। কিন্তু খাদ্যের অভাব আমাদের তো তেমন নাড়া দেয় না। এ একটা ধাঁধাঁ বটে—যা মানি না, তাই মানি—আর যা মানি তা মানি না।

একদিন ছিল যখন আনুষ্ঠানিক ধর্মে মানুষের বিশ্বাস ছিল। তখন অনুষ্ঠান নিরর্থক ছিল না, তা মানুষের মনকে শান্তি দিত। সত্য দিক বা না দিক।

আজ তো যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞানের যুগে বসে বিজ্ঞানের সব সুখ-সুবিধা ভোগ করে অজ্ঞানের চর্চা করে আমোদ পাওয়ার মত অদ্ভুত ব্যাপার কি থাকতে পারে?

অথচ উৎসবেরও প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু উৎসব বা আমোদকে আরাধনা বলার ফলে যে অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, সেটা ক্ষতিকর। সেই কারণে মা দুর্গার সামনে ছেলেরা নির্ভয়ে টুইস্ট নাচছে। এবং দেশ বিদেশের লোক দেখে ভাবছে এরা একটা আধ্যাত্মিক জাতি বটে।

চাঁদার খাতা হাতে করে অনিচ্ছুক গৃহস্থকে বিরক্ত করতে শিক্ষা দেওয়া বা ভদ্রলোকের ছেলেকে পরের কাছে হাত পাততে শেখান যে একটা কুশিক্ষা সেটাই বা কার অজানা আছে?

যেন পূজোর জন্য চাইলেই আর ভিক্ষা হল না? স্ফূর্তি করবে যারা তারাই বা নিজেরা টাকা দেয় না কেন—অপরিচিত লোকের কাছে চাওয়ার দরকার কি? দুর্নীতিরও হাতেখড়ি হচ্ছে ঐখানে। কারণ অনেক সময়ই হিসাব মেলে না। কখনো বা ছোট ছেলেদের জিনিষপত্রের লোভ দেখিয়ে চাঁদা আদায় করতে পাঠান হয়। দলাদলিরও একটা প্রাথমিক পাঠ এখান থেকে সুরু হয়। এসব খবর কে না জানে। সবাই জানে। সবাই নিন্দা করে অথচ সবাই যোগ দেয়।

কারণ শত হোক ধর্মের ব্যাপার। রঘুপতি রাম দুর্গা পূজো করেছিলেন। কিন্তু রাম বা আমাদের প্রপিতামহ তো সুপারসনিক জেট বিমানে পৃথিবী ভ্রমণে যেতেন না, এখন আমরা যাচ্ছি—অর্থাৎ আমাদের জীবনটা বয়ে চলেছে, কিন্তু ধর্মটা দাঁড়িয়ে আছে—যেন ধর্ম জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়া ঘরের একটা আসবাব —আমরা চলে গেলেও সে থাকে কি সত্য কথা বলতে, না, কি ধর্মটা জীবনের অঙ্গ, জীবনের সঙ্গে গ্রথিত, সেই মূল যেখান থেকে মানুষের সমাজ, তার সাহিত্য তার আনন্দ তার শক্তি সবই প্রেরণা পায়, রূপ নেয়—তাই জীবনের সঙ্গে, মনের বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সেও যদি বিকশিত না হয় সে যদি প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিযুক্ত

এবং বছরের কেবল একটা দিনে খেলার বিষয় মাত্র হয়, তবে অধর্মই বেড়ে উঠে। এ কথার প্রমাণ কি আর আজ সমাজের সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে নেই? পূজাকে কেউ ক্রিকেট খেলার সঙ্গে পৃথক করতে পারে কি? সেও বছরের একটা সময়ের ফূর্তি, এও তাই। তারপর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে 'ধর্মের বিসর্জন—'।

আজকে এ সব কথা ভাবা দরকার।

কিছুদিন থেকে দেশপ্রেম নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক চলেছে। মাঝে-মাঝে তো দাঙ্গা হবার উপক্রম। সকলেই প্রেমিক, শুধু প্রেম প্রকাশের তারতম্য নিয়ে ও পন্থা নিয়ে যত উপদ্রব। শুনেছি এক হিন্দী কবি নাকি গণতন্ত্রের প্রবহমান দরিয়ার তীরে বসে কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কল্পনাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। ভি আই পি বলছেন,—আমি দশটা ব্রীজ বানিয়েছি, চৌদ্দটা রাস্তা বানিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমার দুখানা বাড়ী বানিয়েছি, তাই নিয়ে এত নিন্দা কেন? এই পুণ্যময় ভারতের মাটির তৈরী ইট ও সিমেণ্ট ভারতেই আছে, কাঁহা উঠা তো নেই লে গয়া!

সম্প্রতি সীমান্তে আক্রমণের ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত মানুষ না কি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও জাতীয় ঐক্য অনুভব করেছিল। বার বার নানা স্থানে জ্ঞাণীগুণীর বক্তৃতায় একথা শুনেছিলাম। এমন কি একটি উচ্চতম বিদ্যায়তনে চিন্তাবিদদের আলোচনার মধ্যে একজন উপাচার্য তার বক্তৃতায় বলেন—চীনের হামলার আরম্ভে ছাত্র সমাজের মধ্যে যে জাতীয় উদ্দীপনা ও দেশপ্রেম লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ওরা হঠাৎ চলে যাওয়াতে ক্রমেই সে উৎসাহ কমে আসছে—এ স্থলে কি কর্তব্য?

এ্যাংরি ইয়ংম্যান জাতীয় সেখানে কেউ বোধহয় উপস্থিত ছিল না, তাহলে মাননীয় অধ্যাপককে পরামর্শ দিত, যে করে হোক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শত্রুকে ফিরিয়ে আনতে। উপস্থিত ছিল আমাদের মত শীতল—রক্ত পোষমানা ভদ্রজীবগুলি, যারা অনায়াসে এমন গভীর চিন্তাশীল উক্তি হজম করে নিল।

একজন মন্ত্রীও সে সভায় বক্তৃতা করলেন—তার নারীকণ্ঠের সঙ্গে মাইকের স্বর মিলে, একটি সুউচ্চ কলহের ভাব সভাগৃহে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। কলহের প্রতিপক্ষ তাঁরা যাঁরা বিদেশে গিয়ে, সে দেশের প্রশংসা করেন, দেশে ফিরে এসে বিদেশের নিন্দা করেন না, তাদের সে কুকীর্তি এই চিন্তাশীলার মতে দেশ-দ্রোহিতা। এ যুক্তি অনুসারে অবশ্য এ যুগে মিস মেয়োর মত দেশ প্রেমিকা আর নেই। না, আর একজন আছে—সেই যে জার্মান রুঢ়কেল্লা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেশে একখানি বইতে ভারতের স্মৃতি লিখেছে, তার মতে 'ভারতীয়দের জন্য' কি দুঃখে আমরা ব্লাষ্ট ফার্ণেশ বানাতে গেছি, ওরা এমনি অপদার্থ যে চল্লিশ মিলিয়ন ভারতীয় গ্যাস চেম্বারে ঢোকবার উপযুক্ত!' এরকম ধরনের কথা কোনো জার্মানের কলম থেকে বেরুলে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ, দুটো মহা-

যুদ্ধের রক্ত তাদের হাতে মাখা। কিন্তু আমাদের দেশেও বিরোধের উপর ভিত্তি করে দেশপ্রেমকে যারা উদ্বুদ্ধ করতে চায় তাদের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক। কারণ, শিক্ষার যে দুটি প্রধান পথ—অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞের মত (অথরিটি), দুটোই তাঁরা উড়িয়ে দিচ্ছেন। বিরোধের উপর স্থাপিত জাতীয়তাবোধের কতটা মূল্য, ইতিহাস তার প্রমাণ দিচ্ছে—সহস্র সহস্র ইহুদী পুড়িয়ে মেরেও হিটলার জার্মান জাতির ঐক্য ও দেশপ্রেম রক্ষা করতে বা বাড়াতে পারেননি। আজ পাকিস্তানেও নিজেদের সমস্যাগুলির থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি সরিয়ে হিন্দুদের উৎপীড়নের মজায় দেশের মূর্খ লোকদের লাগিয়ে দিয়ে বেশীদিন চলবে না। জাতির তাতে কোন মঙ্গলই হচ্ছে না। আজ চীনও যদি সেই একই উদ্দেশ্যে নিজের সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে দিতে প্রতিবেশীর সীমান্তে এসে হাঙ্গামা বাধাতেই থাকে, তাতেও তার কোন উপকারই হবে না এবং হচ্ছে না। এগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি এবং আমাদের চেয়ে যাঁরা অনেক বেশী দেখতে পারেন, বুঝতে পারেন, জানতে পারেন, সেই পরম জ্ঞানসম্পন্ন দুজন মহাপুরুষ এই সেদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের তাদের জীবন ও বাণী দিয়ে কতরকম করেই বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সেই অভিজ্ঞ সৎ পরামর্শকে আমরা বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে কতটুকু স্থান দিচ্ছি? বেশ মনে পড়ে, চীনা আক্রমণের নৃশংসতা যখন দেশসুদ্ধ লোকের মনকে আতঙ্কিত করে তুলেছে, প্রত্যেক দিনই কি হবে কি হবে এই দুশ্চিন্তায় রেডিওতে কান পেতে আছি, তখন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, জীবনে তিনি কতটা দেশের কথা চিন্তা করেছেন জানি না। কিন্তু অন্ততঃ এইটুকু জানি যে তার 'জীবনই তাঁর বাণী নয়।' তিনি মুখবিকৃতি করে বললেন, 'যান না, নেতারা চরকা ঘোরান গে না, নয়তো উপোস করে ধর্ণা দিয়ে পড়ুন।' ক্রোধে তাঁর চক্ষু ঘূর্ণিত হলো, মুখের মধ্যে পানের ডেলাটা ওলট-পালট করল. আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। জানি না, সত্যিই এর উত্তর কি! জানি না যে সেইটাই আসলে দুর্গতির কারণ। শুনেছি অনেকবার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিরাই বলে গেছেন, কিন্তু বিপদের মুখে বা স্বার্থের সামনে জাতের বড় সত্যগুলোর উপর বিশ্বাস না রাখতে পারাই সমস্ত অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির মূল।

আজ নানা দিক থেকেই জাতীয় জীবন রাহুগ্রস্ত, চোরাবাজার, কালোবাজার ও দুর্নীতির খবর খবরের কাগজে উপচে পড়ছে। অন্যদিকে মানুষের নানা দুর্দশা, অনাহার, আত্মহত্যা, দুর্গতির পঙ্ককুণ্ড শহরে গলিত নালায় নর্দমায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। নানা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মন হাহাকার করছে। দেশপ্রেম শুধু স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থ সাধনের জিগির হয়ে দাঁড়াচ্ছে এরকম একটা অবস্থায় পড়ে অনেক সময় আমরা বুঝতেই পারি না 'দেশ' অর্থ কি? সে কি আমি বা আমার নিজের দল? বা তার চেয়ে ব্যাপক কিছু? দেশকে ভালবাসা মানে তো কোন বিশেষ মত বা দলকে ভালবাসা নয়? দেশের মানুষকে, তার চরিত্রকে তার ব্যবস্থাকে ও তার কতগুলো বিশেষ আদর্শকে ভালোবাসা। বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা চীৎকার করতে পারি কিন্তু প্রেম উদ্বুদ্ধ করতে পারি না।

মহাত্মা একবার বলেছিলেন অপরিচ্ছন্ন দেশে দেশপ্রেম জাগতে পারে না। কথাটার সত্যতা প্রতিদিন নূতন করে বুঝছি। কলকাতার রাস্তার জঞ্জালের পাশে

দাঁড়িয়ে বস্তির পরিবেশে মানব-শিশুকে কুকুর বেড়ালের মত ঘুরে বেড়াতে দেখলে মনে যে ভাবেরই সঞ্চার হোক তা দেশপ্রেম নয়।

এক-এক সময় মনে হয় যেন আমাদের মন থেকে সত্যিই সেই আশ্চর্য বস্তুটি হারিয়ে যাচ্ছে যাকে বলে দেশাত্মবোধ। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমি অনুমান করি এই রকম পরিতপ্ত আরো অনেকেই আছেন যাদের কাছে ১৮-ই আগষ্ট ওয়াশিংটনের রাজপথের দুই লক্ষ নিগ্রো নরনারীর শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা এবং ভিয়েতনামের বৌদ্ধ ভিক্ষুর অনলে আত্মাহুতি, বর্তমান সময়ে, এই মারণাস্ত্রের যুগে, ভারতবর্ষের অস্তিত্বের এক গভীর স্বার্থকতায় সে পরিতাপ ধুয়ে দেবে।

মার্টিন লুথার কিং নিগ্রো—আন্দোলনের এই বর্তমান রূপটিকে মহাত্মার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করেন, আমরা তুলনা করি না। আমরা নিশ্চিত জানি, এ তারই চিন্তার ফসল।

১৯১৬ সালে যুদ্ধ-বিক্ষুব্ধ ইউরোপ ও আমেরিকায় শান্তির বাণী নিয়ে গেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর সেই বাণী শুনে যুদ্ধোন্মত্ত দেশের অনেক লোক, বিশেষতঃ শক্তিশালী খবরের কাগজগুলি তাঁর সেই আন্তর্জাতিক মৈত্রী ভাবনাকে ঘুমপাড়ানীর গান ও যুবকদের পক্ষে বিষের মত ক্ষতিকর মনে করেন, আবার অন্যদিকে যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যেও সেই নিষিদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যাসানালিজম' বিবেকের বাণী জাগিয়ে তোলে।

সে বাণী ভারতবর্ষের বহু পুরাতন কথা। 'সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম, দশম অবতার বুদ্ধের জীবন থেকে যা একভাবে উত্থিত হয়েছিল, বর্তমানকালে সেই চির সত্যকেই নূতন যুগের জীবনে পরীক্ষা করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা-গান্ধী। কখনো মনে হয়েছে, হয়ত তাঁদের সেই আজীবনের প্রাণপন প্রয়াস বিফল হয়েছে কিন্তু আজ প্রমাণ হচ্ছে যে, তা সুদূরপ্রসারী গভীর মূল বিস্তার করে বিশ্ব জীবনে এক নূতন পথ দেখাচ্ছে।

যখন কেউ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর কর্ম ও দর্শন তুলনা করেন, তখন সচরাচর সমসাময়িক হলেও এঁদের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য ছিল সে কথা প্রমাণ করেন। আকৃতি প্রকৃতি ও জীবন বিন্যাসে এঁদের প্রভেদ অনেক। এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মেও এদের মত বিরোধিতা ঘটেছে বারবার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরকা প্রবন্ধটিতে সেই মতদ্বন্দ্বের কারণগুলি নিজেই বিস্তারিত করে বলেছেন। চরকাকে একটি পূজ্য প্রতীক করে তোলায় ছিল তাঁর আপত্তি। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় মনে যুক্তিবাদের বিকাশ চেয়েছিলেন। যে দেশ নানা কু-সংস্কারের মোহগ্রস্ত, কার্য কারণের সংযোগে বিশ্ব নিয়মের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার ক'রে মনগড়া শত শত নিরর্থক আচারে জড়িত হয়ে আছে, তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রয়োজন। সেই কারণেই বিহারে ভূমিকম্পের পরে যখন মহাত্মা বলেছিলেন যে, জাতিভেদের পাপেই বিহার এ শাস্তি পেয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথ কঠোর স্বরে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। অযৌক্তিক চিন্তার নূতন আবাদ করবার তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। এই রকম ছোট বড় নানা ভাবের পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনেই দুজনের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা বহন করেছেন

চিরদিন তা উভয়েরই বহু রচনায় চিরস্থায়ী প্রমাণ রেখে গেছে। মহাত্মা কবিকে সম্বোধন করতেন গুরুদেব বলে আর কবি লিখলেন—আমরা মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, কেউ বা ধনী কেউ বা নিঃস্ব—এক জায়গায় আছে মোদের মিল—সেই মিলের অর্থ এই যে দুজনেই ভারতীয় ইতিহাসের বিশেষ আদর্শকে নব যুগের মানুষের জীবনে রূপ দিচ্ছিলেন। দুজনেই তাই—বিশ্বের মধ্যে ভারতের প্রতিষ্ঠা করছিলেন। এই প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভার বিষয় নয় - ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারাকে আধুনিক জগতের সতত কর্মচঞ্চল উগ্র বিশ্ব ব্যাপারের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেশের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। এই আদর্শ কোন কাল্পনিক ভাবপ্রবণতার ধোঁয়ায় তৈরী বা কবিত্বের খেয়ালে গড়া নয়। অতি প্র্যাকটিক্যাল কার্যকরী বুদ্ধি প্রণোদিত ও বর্তমানকালের যান্ত্রিক সভ্যতার ও বৈজ্ঞানিক অস্ত্রের যুগে মানুষের বাঁচবার একমাত্র উপায়।

আজ নিউক্লীয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধোন্মাদ শক্তি গর্বিত দেশের নেতারা অনেকেই সেই কথায় ফিরে আসছেন যে কথা ১৯১৬ সালে তাদের দেশে বিষবৎ বোধ হয়েছিল।

১৯২৮ সালে ক্যানাডাতে কবি বলেছিলেন, 'আমি দেখতে চাই দ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে আবিষ্কারের সামঞ্জস্য। আমরা বহুদিন থেকে বলে এসেছি, 'আকাশকে জয় করব'—তোমরা তো জয় করলে এখন তেমনি করে নৈতিক সমস্যাগুলি জয় কর।'

একদা বহু ক্লেশ স্বীকার করে পরাধীন দেশের একজন কবি বার বার সারা পৃথিবীতে মৈত্রী-যাত্রা করেছিলেন, আজকের দিনে প্রতাপান্বিত নেতৃবৃন্দ সেই পথই বেছে নিয়েছেন। বহু বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন 'ব্যক্তিগত মানুষই সর্বদা মানুষের উদ্ধার করেছে—মানব সভ্যতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মহৎ ব্যক্তির দান। জগতের পরিবর্তন ঘটবে অজ্ঞাতসারে—কেমন করে ঘটবে আমরা হয়ত তা জানতেও পারব না। হয়ত সেই মুক্তির শক্তি এখনই কাজ করছে এবং আমাদের হয়ত জানাই নেই কত ঊর্ধ্বমুখী মানবচিত্ত নীরবে সেই মুক্তি পথের সাধনা করে চলেছে…আদর্শের সততায় বিশ্বাস স্থির রেখে। যখন সে আদর্শ প্রচার হবে তখন বহু মানুষ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে—তাদের প্রভাবে বিপুল পরিবর্তন ঘটবে, জগত আশ্চর্য হয়ে ভাববে, এ কি করে ঘটতে পারল? আজ দ্রষ্টার ভবিষ্যদ্‌বাণীকে বিশ্লেষণ করে বিস্মিত মনে লক্ষ্য করি, জগতে সবচেয়ে যুদ্ধাশ্রয়ী জাতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর চিন্তার আবেগ কী বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। Organisation-এর মধ্যে Personaity আপন কর্তব্যে রত হয়েছে। মৈত্রী যাত্রায় চলেছেন ক্রূরকর্মা নেতারাও। চলেছেন ক্রুশ্চেভ, আইসেন হাওয়ার, কেনেডি, সঙ্গে সঙ্গে কত মিশন, কত দল, কত গায়ক, বাদক, লেখক, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, মানুষের সম্বন্ধকে সত্য করতে চলেছে।—আর চলেছে অলডারেমাষ্টন মার্চ, চলেছে নিগ্রোদের বিপুল মুক্তি যাত্রা। মহামানবদের জীবনের মাল্য থেকে খসা চিন্তার বীজ ছড়িয়ে যায় আকাশে, তারপরে যথাসময়ে মানুষের মনের ভূমিতে অনুকূল অবসরে তার থেকে উদ্‌ভিন্ন হয় অঙ্কুর। কেউ জানতেও পারে না কি করে এ অমৃত-তরু জন্মাল। এই সেদিন মহাত্মার একজন শিষ্য, 'সীমান্তে শিশুরাও যেতে পারে' এই জাতীয় কোন কথা বলায় নিন্দিত হয়েছেন

বহুজনের দ্বারা। একথার ক্যারিকেচার হয়েছে প্রচুর। যে সমস্ত পত্র-পত্রিকায় ভাষণটি প্রকাশিত হয়নি তারাই ক্যারিকেচার ছেপেছে। কথাটি হাস্যকর অবশ্যই —কারণ হত্যাই যুদ্ধের কাম্য, আত্মহত্যা নয়। এ যেন সেই সীমান্তে চরকা নিয়ে বসে যাওয়ার মতন। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে, বর্তমান যুগে যুদ্ধের এক নূতন রীতি প্রবর্তন করে গিয়েছেন এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বীর মহাত্মা গান্ধী। এই রীতি কিন্তু কেবল সত্যাগ্রহীই গ্রহণ করতে পারে, যে যুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চায়। লোভের তাড়নায় অপরকে হনন করার জন্য যে যুদ্ধ এ রীতি সে যুদ্ধের নয়। অর্থাৎ আক্রমণকারী যুদ্ধক্ষেত্রে শিশু বা নিরস্ত্রকে পাঠাতে পারে না, কিন্তু সত্যাগ্রহী পারে। কামানের মুখে বন্দুকের মুখে যখন নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী দাঁড়ায় তখন সে শিশু ছাড়া কি? তার বয়স তখন তার কি কাজে লাগবে? রবীন্দ্রনাথ গান করেছিলেন—শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরও—সেই দুর্বলের গায়ের শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ভাঙ্গা দেশ জোড়া লেগেছিল। এই দুর্বলের বলকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বাস্তবভাবে প্রয়োগ করলেন গান্ধীজী। শত বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আদর্শে ছিলেন স্থির এবং তার অমোঘ ফল ফলল। সে ফল যে কত সুদূর প্রসারী তা আজ যেমন বোঝা যাচ্ছে, এমন তখন যায়নি।

ডাণ্ডি মার্চের সময় শুধু ইংরেজী কাগজই তাকে Lunatic বলেনি, দেশের লোকও বলেছে। অসহায় নরনারীকে পুলিশের ডাণ্ডার সামনে নিয়ে চলে এই উন্মাদ—অস্ত্রের সঙ্গে শুধু হাতে লড়াই, পাগলামি ছাড়া আর কি? কিন্তু আজ? আজ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের সামনে জগতের সমস্ত সৈনিকই শুধু হাত হয়ে গেছে। তাই আজ নিরস্ত্র চিন্তা শক্তিকেই যুদ্ধের অস্ত্র করা ছাড়া উপায় নেই। সেই কারণেই কিউবা থেকে বিপুল রণসজ্জা ফিরে এলো। শুধু তফাৎ এই যে পাশ্চাত্য জগতে এগুলো আজও বাহ্যিক কারণে নিয়ন্ত্রিত, সুবিধার খাতিরে গৃহীত। কিন্তু সত্যাগ্রহীর আগ্রহের কারণ আরো অনেক গূঢ় মূলে। কিন্তু আশার সঞ্চার হয়েছে 'মরা মরা' বলতে বলতে ওরাও রাম নাম বলবে।

যে বৌদ্ধ ভিক্ষু সরকারী অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেকে আহুতি দিলেন, তিনি কি সীমান্তে শিশু পাঠাবার মতই কাজ করেননি? শত্রুপক্ষ মুখে শুষ্ক হাসি এনে বল্লে, ভালই হলো এরকম আরো মরুক। কিন্তু সে বলা কি সহজ? ভয় কি ঢোকেনি? জগতের মধ্যে এই আত্মাহুতি যে আন্দোলন তুলেছে তাতে পাষাণে বাঁধানো শাসনের ভিত্তি কি নড়ে যায় নি? ঐ ভিক্ষু যদি তার বদলে দুটো গুপ্ত হত্যা করতেন তাহলেই কি তার যুদ্ধ আরো কার্যকরী বাস্তব হতো? মধ্য এশিয়ার নানা রাজ্যে ও আরো নানা জায়গায় কত রাজনৈতিক হত্যা হচ্ছে তার কোনটা মানুষের মনকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে? অষ্ট মার্গের নীতি পঞ্চশীলের অভ্যাস, ঐ ভিক্ষুকে আত্মত্যাগের শিক্ষা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে উপবাসে প্রাণত্যাগ সত্যাগ্রহ, শান্তিপূর্ণ অসহযোগকে যুদ্ধের অস্ত্র রূপে ব্যবহার করল কে? এ আবিষ্কার কার? নিঃসংশয়ে মহাত্মা গান্ধীর। তাঁর এ অস্ত্র নব যুগের অস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রের একমাত্র প্রতিষেধক। বৈজ্ঞানিকের তৈরী মারণাস্ত্রের চেয়ে এ বেশী কার্যকরী হবে, তার আভাস দেখা যাচ্ছে। কারণ, সমগ্র জগতে বিভিন্ন দেশে এই অহিংস নীতিতে ন্যায় বিচারের দাবী

জানাচ্ছে অত্যাচারিত মানব।

পৃথিবীর একটি বাস্তববাদী দেশ যাদের হাতে এটম্ বোমা, যারা তা দু দুবার জনাকীর্ণ নগরীর উপর পরীক্ষা করেও নিয়েছে, সেই দেশের রাজপথে দুই লক্ষ নরনারীর মুক্তির দাবীতে অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা গেল না, তারা শুধু উদাত্ত সঙ্গীতে বিশ্বের বিবেককে জাগ্রত করে দুটি মাইল পদযাত্রা করল, এই সংবাদ পড়তে পড়তে মনে হয়েছে একদা মহাত্মার প্রিয় গান ছিল, 'একলা চলরে—কিন্তু আজ আর তিনি একলা নন, বিশ্বের নানা দেশে নানা প্রসঙ্গে অত্যাচারিত মানুষ সত্যের সন্ধানে তাঁরই পথে তাঁকেই পুরোভাগে নিয়ে চলেছে, সে কথা তাঁরা জানুক বা না জানুক।

বিশ্বের জীবনে মহৎ ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের এই যে দান, এ কারু চেয়ে কম নয়, এমন কি এটম বোমা বানান বা মহাকাশে ওড়ার চেয়েও কম নয়।

বহু নিরর্থক জঞ্জালের মধ্যে বেঁচে থাকার এই আমাদের পরম সার্থকতা।

ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ

সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ও স্বাধীনতা দিবস এই দুটি বাঙালীর, বিশেষতঃ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাসম্পন্ন বাঙালীর উৎসবের দিন। কিন্তু আজ সীমান্তের দুই পারে বাঙালীর মনে গৃহচ্যুত নিরাশ্রয়, বিপন্ন নরনারীর আর্ত শিবিরের দিকে তাকিয়ে হয়ত সেই কথাই মনে হচ্ছে—"মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব ?"

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুলোক বাস করেন—তাঁরা তাই ব'লে ভারতীয় নন, একথা যদি আমরা মূলতঃ সত্য বলে জানতাম, তাদের যদি ভিন্ন নেশন বলে জানতাম, তা হলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের রূপও ভিন্ন আকার ধারণ করত। সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য কি তা রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাটিতে আমরা বুঝতে পারব—"আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি, ব্রাহ্ম সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছি, ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি, কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কি করিয়া ? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া ? তবে কি মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পারো ? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্ক মাত্র নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা কি বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, অর্থাৎ তাহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মে খৃষ্টান।...বাঙ্গলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা তাহাদের অহর্নিশি তোমরা হিন্দু নও, তোমরা হিন্দু নও বলিয়াছে—এবং তাহারাও নিজেদের হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়াছে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃত হিন্দু-মুসলমান। কোন হিন্দু পরিবারে এক ভাই খৃষ্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতা-মাতার স্নেহে বাস করিতেছে এই কথা

কল্পনা করা কখনই দুঃসাধ্য নহে, বরং ইহাই কল্পনা করা সহজ, কারণ ইহাই যথার্থ সত্য। সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর……।' হংকং এ দেখেছি এক ভাই খৃষ্টান অন্য ভাই বৌদ্ধ—বা তাও।

"হিন্দু শব্দে ও মুসলমান শব্দে একই পর্যায় বোঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম, কিন্তু হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ এক আলো এক ভৌগোলিক নদনদী পর্বতের মধ্য দিয়া অন্তর বাহিরের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাত পরম্পরায় একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক সত্য আমাদের চিন্তাগুরুরা কোনদিন অস্বীকার করেননি। সেই কারণে বঙ্গ বিভাগ বাঙালীর মনে গভীর আবেগ উদ্বেলিত করে তুলেছিল। অবশেষে যে স্বেচ্ছায় সেই বঙ্গ বিভাগকে এক মাত্র সমাধান রূপে বাঙালী মেনে নিয়েছিল, তা বড় সুখের সঙ্গে নয়। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে এ বিভাগের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষমতালিপ্সু নেতারাই দায়ী, যারা কোন মতেই হিন্দু-মুসলমানকে এক জাতিরূপে দেখবেন না বলে মনস্থ করেছিলেন, তাদেরই জন্য মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি চিরদিনের মত ভাগ হয়ে গেল। তবুও আমাদের যারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধের আরম্ভ থেকে এই বাধাতে বিদ্বেষাপন্ন হয়ে উঠেননি। কেন মুসলমান হিন্দু গরিষ্ঠতার হেতু তার সঙ্গে মিলিত হতে ভয় পেয়েছে, তা সহৃদয় বিবেচনার সঙ্গে যুক্তির দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করেছেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআবরু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই—আমরা বিদ্যালয় ও অফিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানদের জোরের সঙ্গে ঠেলিয়া দিয়াছি—সেটা সম্পূর্ণ প্রীতিকর নহে জানি, তবু সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে হৃদয়ে লাগে না কিন্তু সমাজের অপমানটা গায়ে লাগে না হৃদয়ে লাগে। কারণ সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে পরস্পরের পার্থক্যের উপর সুশোভন সামঞ্জস্যের আস্তরণ বিছাইয়া দেওয়া। বঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর তাহার বেদনা অপরিচ্ছন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে, আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।" এ কথার সত্যতা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যায় না, হয়ত বলা যায় যে, তার আগেও ইতিহাস আছে, আওরঙ্গজেবের ইতিহাস, জিজিয়া করের ইতিহাস, কাফের নিধনের ইতিহাস, কিন্তু আমাদের এ বিশ্বাস

ছিল যে, রক্তের ইতিহাসকে রক্ত দিয়ে শোধ করা এবং চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁতের কথা হিন্দুর ধর্মের নয়। বিবেকানন্দ বলেন—'আমরা হিন্দুরা কেবল পরমত সহিষ্ণু নই, আমরা প্রত্যেক ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া জানি এবং তাই মুসলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, জরথুস্ত্রীয়দের অগ্নি সমক্ষে উপাসনা করি। খৃষ্টানদের ক্রুশের সামনে মাথা নত করি। কারণ আমরা জানি—প্রত্যেক মানবাত্মা নিজ জন্ম ও আবেষ্টনের পরিপ্রেক্ষিতে অনন্তকে ধরিবার ও বুঝিবার জন্য ঐরূপ বিবিধ চেষ্টায় ব্যাপৃত আছে।'

রবীন্দ্রনাথ বলেন—'হিন্দু সমাজের কর্তব্য যাহা ধর্ম তাহাই পালন কর। অর্থাৎ যাহাতে সকলেরই মঙ্গল তাহাই অনুষ্ঠান কর—কোন অন্যায়ই কোন সমাজের পক্ষে নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না—অতএব হিন্দু থাকিতে গেলে আমাকে অন্যায় করিতে হইবে, একথা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে পারি না। মনে রাখা দরকার ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিষ নয়। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে, তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। ধর্ম বলে যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে ঘরেই জন্মাক, পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে যে মানুষ ব্রাহ্মণ, মানুষ যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তি মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।'

আজকের যুগে এই মুক্ত ধর্মের উদ্বোধন করে গিয়েছেন আমাদের যে জ্ঞানগুরুরা, তাঁদের জন্ম-জয়ন্তী আমরা উৎসাহের সঙ্গে পালন করি, অতএব তাঁদের কথাগুলি, নির্দ্দেশিত পথগুলি নিশ্চয়ই পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে উচ্চারিত নীতিগুলির চেয়ে অবজ্ঞার যোগ্য নয়—কারণ যদিও মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যক্তিদের কর্ম ও চিন্তা মনোমত না হলে সেগুলিকে 'বড় বড় বুলি' বলে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করি না, তবু জয়ন্তী উৎসবের বেলা, কিন্তু তাদেরই স্মরণ করতে হয়, অন্ততঃ আজ পর্যন্ত কোন জনপ্রিয় খবরের কাগজের সম্পাদকের জন্ম-জয়ন্তীর কথা কোন ক্লাবের ছেলেরাও চিন্তা করে উঠতে পারেননি। প্রশ্ন উঠতে পারে এ সমস্যার সমাধান কি? সমাধান একটি বড়ি নয়, যা গিলে ফেলা যাবে বা এটি formula নয় যে তৎক্ষণাৎ অংক কষে বের করে ফেলবে। যারা মনে করেন পঞ্চাশ মিলিয়ন নবনারীকে স্থানচ্যুত, গৃহচ্যুত, কর্মচ্যুত, মাতৃ-অঙ্কচ্যুত করবেন, তাঁরা যে অংকটা কষতে চান সেটা সহজ নয়; তবু সমাধান নেই এমন নয়। সমাধান আছে এবং বহু দেশে তার সার্থক পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। বহু মানুষের জীবনের গতি ও চিন্তাধারার পরিবর্তনে সমসাময়িক বিশ্বের চিন্তাধারাকে স্বীকার করে। যুগধর্মকে গ্রহণ করাই তার প্রকৃষ্ট পথ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সমস্যা তো এই কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তন যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্য সাধনা ও ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে, মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাহিরে যাত্রা করতে হবে। আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোন রকম স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষা দ্বারা, সাধনা দ্বারা সেই যুগের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড় এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে

হবে, তারপর আমাদের কল্যাণ হবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগ পরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব। যদি না আসি, 'তবে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।' এ পন্থা যারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক প্রথায় দাঁতের বদলে দাঁত ও চোখের বদলে চোখ করতেই থাকুন, কিন্তু রবীন্দ্র জয়ন্তী করবেন না নিশ্চয়ই, কারণ তারা যে যুগে বাস করেন সে যুগে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি।

বাংলাদেশের যুদ্ধ

২৬ শে মার্চ সকালে খবরের কাগজ খোলবার আগেই টেলিফোন পেলাম একজন সহকর্মীর কাছ থেকে। উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—ওদের এরকম-ভাবে গুঁড়িয়ে মেরে ফেলবে আমরা কিছু করব না? এখনই ইন্দিরা গান্ধীকে টেলিগ্রাম করা হোক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার—'

সেদিনের সে ব্যাকুলতা মনে পড়লে আজ আশ্চর্য লাগে কেমন করে ধীরে ধীরে একটি প্রেরণার মৃত্যু হল। বস্তুত সেদিন বাংলাদেশের এই আন্দোলন অর্থাৎ তার সংস্কৃতির স্বাধীনতা চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কাছে হয়েছিল একটি প্রেরণা।

গত আট বছর ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ পূর্ববঙ্গের লোক ও চিন্তা-বিদদের জীবনের নবজাগরণের মধ্যে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটবে মনে করে তাঁদের লেখা নিয়মিতভাবে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু সে প্রচার খুব ব্যাপকতা লাভ করেনি যদিও শিক্ষিত সমাজে কিছু কিছু মানুষ পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের খবর পেয়ে থাকেন, কিন্তু তার ব্যাপকতা, গভীরতা সম্বন্ধে অধিকাংশ মানুষই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অনেকেরই ধারণা ছিল যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখক বা ছাত্রই অসাম্প্রদায়িক চিন্তা ও বঙ্গ সংস্কৃতির আলোচনা করছেন এর যথার্থ কোনো মূল্য নেই।

তাই ইলেকশনের অভূতপূর্ব ফলাফল ও তৎপরে ইয়াহিয়া বাহিনীর অসতর্ক আক্রমণের ফলে উদ্ভাসিত 'বাংলাদেশ' আন্দোলনের রূপে এদেশের বহুলোক আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে দফায় দফায় শরণার্থী প্রবাহ এদেশের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে ক্রমাগতই খুঁচিয়ে দগদগে করে রাখছিল। জনপ্রিয়তা সন্ধানী এদেশের বহু পত্রপত্রিকা তাতে ইন্ধন জোগাত অর্থাৎ যে তিক্ততা নিয়ে দেশ ভাগ হয়েছিল তা দিনে দিনে বেড়েছিল, কমেনি। অপর পক্ষে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান আন্দোলন সফল হওয়া মাত্রই যেন সেখানকার শিক্ষিত মন অনুভব করল মাতৃক্রোড়চ্যুত হবার বেদনা। এবং দেশভাগ করে যে স্বাধীনতা পাওয়া গেল সে যেন নাকের বদলে নরুণ পাওয়া! তাই পূর্ব পাকিস্তানবাসী

বাঙালী মুসলমানের অন্তরে যে বেদনা ক্রমে তাকে বাংলার তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহশীল করে তুলল প্রকৃত পক্ষে তা ঘরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্যই পূর্বপাকিস্তানী অবাঙালী মুসলমানরা তার শরিক হতে পারল না — তারা যে এখনও সেই বিশ বছর আগের অবস্থায় আছে, যে অবস্থায় ভারতীয় বহু হিন্দু-মুসলমান তাদের সঙ্গে সমভাবাপন্ন। এদেশে সরকারী নথিপত্রে সেকুলারিজিমের বর্ণনা থাকলেও বেশির ভাগ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মনে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি এ সত্য অপ্রিয় হলেও মানতেই হবে।

এমন সময় ২৫শে মার্চের রাত্রে অসতর্ক আক্রমণে শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের রক্ত মিশল বাংলাদেশে—যা ছিল বই এর কথা মুখের কথা তার মূর্ত্যু পূতঃ সজীব মূর্তি স্পষ্ট হল আমাদের কাছে।

বাংলাদেশের আন্দোলন তাই হল একটি মহৎ প্রেরণা।

স্বকর্ণে শুনলাম স্বচক্ষে দেখলাম যে-যাঁরা এত দিন আমাদের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি চেষ্টাকে বিদ্রূপ করতেন, যাঁরা সর্বদা স্বচ্ছন্দে বলতেন, ও জাতকে বিশ্বাস নেই। সেটা যে তাঁদের একটা মুখের কথা মাত্র অন্তরের কথা নয় তার প্রমাণ। বাঙালীর ডাকে বাঙালীর প্রাণে সাড়া লাগল। মানুষের দুঃখে মানুষের প্রাণ গলল। মানুষের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ ওদেশের মানুষের সঙ্গে এক সঙ্গে বুখে দাঁড়াল।

এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশে যাঁরা শরণার্থী এলেন তারা বেশির ভাগই শিক্ষিত মুসলমান—তাঁরা পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে সমাদর ও সম্মান পেলেন অপরিমিত—সাম্প্রদায়িকতায় দূষিত আবহাওয়া যেন সমুদ্রের বাতাসে নির্মল হয়ে গেল। সে মিলনের মহা সমুদ্রের কলধ্বনি শোনা গেল সীমান্তে সীমান্তে মানুষের পায়ে পায়ে। দেখলাম যে যা পারে ভারে ভারে জিনিসপত্র নিয়ে সীমান্তের স্থানে স্থানে ছুটেছে ওপারের যুদ্ধরত মানুষের কাছে সাহায্য পৌঁছে দিতে। সে সময়ে বিশ্বাস ছিল এ হয়ত দু' চারদিনে মীমাংসা হয়ে যাবে। ভারত সরকার দৃঢ় পদে এগিয়ে আসবেন দুষ্কৃতকারী চণ্ডাল পাকিস্তানিদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানে। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ তার বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতা পাবে।

যতই সময় যায় এদেশের মানুষ হতাশ হয়ে পড়ে সরকারের সাবধানী পদ-ক্ষেপের অর্থ বুঝতে পারে না। উৎসাহ তার স্বাভাবিক নিয়মে তেল ফুরানো সলতের মত নিভে আসতে চায়।

ইতিমধ্যে সুরু হল গ্রামবাসী হিন্দুদের সুপরিকল্পিত বিতাড়ন। হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে লোক প্রবেশ করতে লাগল বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে। বনগাঁ থেকে একুশ মাইল দূরে এমনি একটি সীমান্ত 'বয়রা'। যেখান থেকে একদিনে এক লক্ষ লোক প্রবেশ করতে দেখেছি। বাইশ মাইল জুড়ে জনতার পদযাত্রা মাথায় মাথায় লেগে উর্ধ্বশ্বাস দ্রুতগতি—সে গতিতে ছেলেমেয়ে পর্যন্ত ছিটকে পড়েছে—কে কোথায় গেছে ঠিক নেই। একটি রোরুদ্যমান যুবতী দেখলাম, শুনলাম ক্ষেতে কাজ করছিল এমন সময় শুরু হল গুলী বর্ষণ। ঘরে ঘুমাচ্ছিল শিশু তাকে ফেলেই দলের সঙ্গে ছুটে এসেছে।

দেখেছি একটি পা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হলেও রক্তাপ্লুত শরীরে দু দিন ধরে গড়িয়ে

আসা মানুষ। তখনও মনোবল অক্ষুণ্ণ জয় বাংলার ধ্বনি মুখে। এইরকম মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর জন্য ভারত সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন—সাহায্য করতে এগিয়ে এলো দেশ-বিদেশের নানা দুর্গতত্রাণ প্রতিষ্ঠান।

পথ শ্রান্তি, কলেরার আক্রমণ. অনাহার ও অব্যবস্থার মধ্যে বহু মানুষ মারা গেল ও এই দুর্গতি যেন জীবন তৃষ্ণাকে আরো বাড়িয়ে তুলল।

বর্তমানে শরণার্থী শিবিরগুলিতে মোটামুটি বন্দোবস্ত হয়েছে। অবিরত বৃষ্টি ও বন্যার আক্রমণ না হলে প্রায় এক কোটি লোকের জন্য এত অল্প সময়ে যা ব্যবস্থা হয়েছে তাকে সুব্যবস্থা বললে অন্যায় হয় না। প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও দুবেলা পেট ভরে খাবার পাচ্ছেন—অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন লণ্ঠন, বাসন, কাপড়, জামা ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। নানা দাতব্য প্রতিষ্ঠানও জিনিসপত্র দিচ্ছেন—এক কোটি ছিন্নমূল লোককে আগায় জল ঢেলে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছে অবিশ্রাম। কিন্তু গাছও ঐ অবস্থায় বাঁচতে পারে না—মানুষও না। মানুষের শরীর হয়ত বাঁচে কিন্তু মনের ঘটে অপমৃত্যু বার বার শরণার্থী ত্রাণ-কার্যের দ্বারা এইভাবে বহু মানুষকে মানসিক মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবারে কিন্তু প্রথম থেকেই ভারত সরকার বলে আসছেন শরণার্থীরা বিদেশী তাঁদের দেশ ('স্বাধীন হলে' কথাটা ব্যবহার করেন নি) ফেরবার উপযুক্ত হলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। অন্যান্য বারের শরণার্থীদের সঙ্গে এবারের শরণার্থীদের পার্থক্য এই যে এবার হিন্দুরাও বলেছেন দেশ স্বাধীন হলে ফিরে যাব। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থী শিবিরগুলিতে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশী—এ নিয়ে এদেশে নানা জনে উদ্বিগ্ন কেউ বা সেই পুরাতন চিন্তার অজীর্ণ রোগে আবার আক্রান্ত কিন্তু বিভিন্ন শিবিরে এই পুরো পাঁচ মাস ক্রমাগত কাজ করার ফলে বিশেষত একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার দ্বারা এবিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত যে এবারে হিন্দুরা বিশেষভাবে একশ্রেণীর মুসলমানের দ্বারা উপদ্রুত হলেও সেটা যে পাকিস্তানি চক্রান্ত এবং পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যে দুটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছেন যা ইতিপূর্বে কোনো শরণার্থী ভাবেন নি।

'বাংলাদেশ' তাই একটি সত্য। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অনলস কর্মের প্রয়োজন আছে সেটি কেবল গেরিলা যুদ্ধ নয়—এ দেশে যে সব বাঙালী চলে এসেছেন কি হিন্দু কি মুসলমান তাদের অন্তরে সেই চিন্তার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা চাই।

যাঁরা প্রথম থেকে শরণার্থী শিবিরে শিবিরে নানা কাজে ঘুরছেন তারা জানেন মুক্তি যুদ্ধের এই দিকটি কত অবহেলিত। হিন্দুরা যাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই কোনোদিন পাকিস্তানে মর্যাদা পাননি ও সেই কারণে সে দেশকে ভালোবাসতে পারেন নি তাঁরা এই সবে বাংলাদেশে যেন হারান মাতৃভূমিকে ফিরে পাচ্ছিলেন কিন্তু ভারতের বৃহত্তর ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়ে তাঁদের একটি নিরুদ্বেগ স্বাচ্ছন্দ্য এসে পড়া অসম্ভব তো নয়ই স্বাভাবিক। তাছাড়া কর্মহীন জীবনে কোনো প্রেরণা রক্ষা করা অসম্ভব। এই এক কোটি মানুষের মধ্যে সুস্থ সবল স্ত্রী পুরুষ কেবল অন্ন চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে, লাইন পড়ছে নানা নামে। ভুয়া কার্ড হচ্ছে এবং প্রত্যেক

ক্যাম্পের নিকটে রেশনের চাল ডাল কয়লা বিক্রী হচ্ছে। এই অবস্থায় অর্থের প্রয়োজনীয়তা এত বেশি যে আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ কেউ সনাক্ত করে না পাছে রেশন কার্ড কাটা যায়।

পূর্বে যে সব শরণার্থী এসেছিল সরকার তাদের বিভিন্ন খাতে টাকা দিতেন। যেমন মেয়ের বিয়ের জন্য ২০০্ দেওয়া হত—শুনেছি মেয়ে একটি কিন্তু বহুবার তার বিয়ে দেখিয়ে টাকা সংগ্রহ হত।

উপকার করতে গিয়ে এই ধরনের সামাজিক ব্যাধি সৃষ্টি করার দৃষ্টান্ত সরকার এবং রাজনৈতিক দল উভয়েই পূর্বে করেছেন। কিন্তু এবারে ব্যাপারটা অন্যরকম।

খুব স্বাভাবিক—কিন্তু এর ফলে যা অনিবার্যভাবে ঘটছে ও ঘটবে তা হচ্ছে একটি মহৎ প্রেরণার অপমৃত্যু।

শুনছি দেশ-বিদেশে ভারতের প্রশংসা হচ্ছে এভাবে এক কোটি মানুষের দায়িত্ব নেওয়াতে। ভারত সরকার যা করেছেন তা ভারতের পক্ষে প্রশংসনীয় হলেও কাজটার পরিণতি ভয়ানক।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি যে ইতিমধ্যেই একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততা সৃষ্টি হয়েছে 'যেন এমনি করেই যায় যত দিন যাক না!" এরই প্রামাণ্য ঘটনা প্রতি ক্যাম্পে ক্যাম্পে পূজার আয়োজন—এত বড় রক্তনদীর পাশে দাঁড়িয়ে আজ কি করে পূজার সমারোহ হতে পারে তা চিন্তা করলে এক ভয়াবহ পরিণতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশ্ন জাগে এত লোকের প্রাণ কি বিফলে গেল। 'বাঙলাদেশ' যদি এই এক কোটি লোকের জীবনে চিন্তায় কর্মে সত্য হয়ে জীবন্ত হয়ে না উঠে তাহলে যে ছয় কোটি মানুষ অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করে দেশের ভিতরে যুদ্ধ করে চলেছে তাদের সঙ্গে এরা মিলবে কি করে?

এই বিষয়ে বাঙলা দেশের যে সব নেতৃবৃন্দ এপারে রয়েছেন, যে সব বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষভাবে এই দায়িত্ব বহন করার যোগ্য তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যথোচিত পালন করছেন কিনা তাও বলা শক্ত। যে এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রিত তাদের শরীর রক্ষার দায়িত্ব ভারত নিলেও তাদের মন ও চিন্তাকে জাগ্রত উদাত্ত ও দেশাভিমুখী রাখবার দায়িত্ব তাঁদের।

ক্যাম্পে ক্যাম্পে যে ক্লিন্ন পরিবেশ শরণার্থীরা নিজেরা সৃষ্টি করে নিজেরাই দুর্গত হচ্ছেন তাঁদের সে অবস্থা থেকে রক্ষা করবে কে? কেই বা শরণার্থী জীবনের বহুবিধ গ্লানির আক্রমণ রোধ করবে—যাতে তারা একদিন স্বাধীন বাঙলায় ফিরে গেলে উপযুক্ত নাগরিক না হয়ে ভ্রষ্টতা নিয়ে না যায় সে দায়িত্ব কার?

স্বাধীনতার প্রস্তুতি কেবল শাস্ত্রে নেই সমাজের সর্বস্তরে বহুবিধ কর্মের মধ্যে সদা সচেষ্ট না থাকলে তা বিফল হয়। স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতেও বহু নেতা তা বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে আজ আমরা ভুগছি।

অপর পক্ষে যে সব শিল্পী সাহিত্যিক দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে নিঃসংশয়ে নিষ্কলুষতার সঙ্গে এগিয়েছিলেন তারা আজ এ দেশের বণিকবৃত্তি পরায়ণ সাহিত্য শিল্পের ছোঁয়াচে শুদ্ধ থাকতে কতটা পারবেন সে সম্বন্ধেও সন্দিহান হবার কারণ রয়েছে।

বাঙলাদেশের সংস্কৃতি চেতনা উদ্ভূত দেশপ্রেম কেন আমাদের দেশে একটি

মহৎ প্রেরণা তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ছে। মে মাসের শেষের দিকে তখন সবে শিল্পী সাহিত্যিকরা দলে দলে আসছেন—বনগাঁর একটি ক্যাম্পে আমার সঙ্গে ঘুরছিলেন বাঙলা দেশের একটি গায়ক তিনি কথা প্রসঙ্গে খুব বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে আমাকে বললেন—আপনাদের দেশে দেখছি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে লোকে মোটা মোটা টাকা পায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করে টাকা রোজগার করার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের চেতনা, আমাদের সংকল্প স্থির রাখে. তাকে নিয়ে ব্যবসা করার কথা আমরা ভাবতে পারি না। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবার জন্য কেউ টাকা দিতে চাইলে আমরা অপমানিত হব।''

পশ্চিমবঙ্গে এই মনোভাব ক'দিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে? যে দেশের সাহিত্য আজ সুলভ পণ্যে পরিণত—রবীন্দ্রসঙ্গীত যেখানে কেবলই ব্যবসায়ের মূলধন ও রবীন্দ্র জন্মোৎসবও তথৈবচ? এর উপরে আছে দেশ-বিদেশের হিতকামী গোষ্ঠী যারা নানা উদ্দেশ্যে দুহাতে টাকা ছড়িয়ে সংস্কৃতি বাঁচাতে এসেছে। মানুষের চরম দুঃখ-দুর্দশার মুহূর্তে প্রলোভনের জাল বিস্তার করে কয়েকটি হিতকামী সংস্থা চূড়ান্ত অনিষ্ট করে চলেছেন।

যারা আজ ভারতে শরণার্থী তাদের মধ্যে দুটি জাত সৃষ্টি হচ্ছে। এক যারা পড়ে আছে চরম নৈতিক ও কায়িক দুর্গতিতে আর যারা ৫০০।৬০০ টাকা বাড়ি ভাড়া দিতে সমর্থ। ফলে দুই স্তরেই বিপদ ঘটবে। উভয়ের উভয়কে প্রয়োজন ঘনিষ্ঠ ভাবে। যারা প্রাণ দিয়ে দেশের মধ্যে লড়ছে—তাদের সঙ্গে যাতে সংযোগের সেতু ভঙ্গ না হয়ে যায় সেইটাই আজ শরণার্থীদের সবচেয়ে লক্ষ্য রাখবার বিষয়।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে যে প্রেরণা জেগেছিল পরে সেই প্রেরণার অপমৃত্যু আমরা দেখেছি—যে গান্ধী খৃষ্টের মত মৃত্যু বরণ করলেন তারই নামে গান্ধী টুপি পরে চলল বহু দুষ্কর্ম। বিশ বছর পরেও স্বাধীনতার আকৃতি-প্রকৃতি আজ এ দেশে তাই এত নৈরাশ্যব্যঞ্জক।

এক অত্যাচারী প্রবঞ্চকের হাত থেকে অন্য প্রবঞ্চকের হাতে পড়ায় মুক্তি নেই এবং শিকল গড়ার কারখানা প্রত্যেকের নিজের মধ্যে রয়েছে।

আজ শিবিরে শিবিরে অকর্মণ্য অলস নিরর্থক জীবনে যারা কয়েকমাস ধরে নিচের দিকে নামছেন তাদের খুব পাশে গিয়ে দাঁড়ান ও এই বিপদ থেকে রক্ষা করাই সংস্কৃতিকে বাঁচান। যুদ্ধের এটি একটি প্রয়োজনীয় স্তর বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রেক্ষাগৃহ নয়।

বাঙলা দেশের যুদ্ধ জয় হবেই কিন্তু যারা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন তাঁরাও যেন বিজয়ীর শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেন সে বিষয়ে হিতৈষী সকলেরই সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

ভারত ও বাংলাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, প্রথমেই ভারতের কথাটা মনে আসে। ভারতে অধিকাংশ মানুষ দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানকে ভীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। এই দুই ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন দফায় দফায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে গৃহচ্যুত অত্যাচারিত নরনারী ভারতে আশ্রয় নিতে এসেছে ও জনসংখ্যার চাপে পশ্চিমবঙ্গ বেসামাল হয়ে গিয়েছে। অপরপক্ষে পাকিস্তানে তো হিন্দু-বিদ্বেষ ও ভারত বিদ্বেষ প্রচার করা, খুঁটিয়ে তোলা একটি সরকারী পর্যায়ের কর্ম। পাকিস্তানের অস্তিত্বই ভারত-বিদ্বেষ ও হিন্দু বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতেও মুসলমান বিদ্বেষ ছিল ও আছে এবং ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমান সকলেই হিন্দু প্রেমিকও নয়। তবু এই অনৈক্য সরকারকে কোনো দিকে বেশি পক্ষপাতী করতে পারে না কারণ এই বৃহৎ গণতন্ত্র হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্যই এই দুই দেশের সাম্প্রদায়িকতার রূপও এক নয়। পাকিস্তানে ছিল সরকারের প্ররোচনা এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটেছে প্রতিহিংসা পরায়ণতায়। অপর দিকে পাকিস্তান দ্বন্দ্বটা জাগিয়ে রাখতে চাইছিল, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভেদ ও শঙ্কা জাগিয়ে রাখতো কারণ পাকিস্তান হবার অল্প পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীর প্রভুত্ব, মদমত্ততা বাঙ্গালীর অনুভূতিপ্রবণ মনের উপর আঘাত করছিল। পাঞ্জাবীর শারীরিক শক্তিতে অথবা কাজে-কর্মে শ্রেষ্ঠত্ব কিছুটা থাকায় এই অভিমান আরো তীব্র হয়ে উঠছিল। ফলে বাঙ্গালী মুসলমান প্রথম সন্ধান করতে বেরুল তার শক্তি বা শ্রেষ্ঠত্বর উৎসটা কোথায়। সেটা ত শারীরিক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বা রং এ নয়—এমন কি বাহুর পেশিতেও নয়। এই উৎসের সন্ধানে গিয়ে সে নূতন দৃষ্টিতে তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে দেখল। এই ভাষা ও সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ঐতিহ্য। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই সত্য টাকে সযত্নে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল শুধু নয়, খুব জোর গলায় অস্বীকার করাও হয়েছিল এবং মুসলমান বাঙ্গালীর জন্য একটা খিচুড়ি ভাষা তৈরী করার চেষ্টাও চলেছিল। "মহম্মদী" কাগজে ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত ছিল। অর্থাৎ সারা ভারতের মুসলমান এক জাতি হিন্দু অন্য জাতি এই যুক্তির উপর দেশ ভাগ করতে গেলে, ভাষা ও সংস্কৃতিকেও ভাগ করে ফেলতে হয়। সে সময় বাঙ্গালী মুসলমানও বিভ্রান্ত হয়েছিল. এমন কি মুসলমানও যে বাঙ্গালী এটা অনেক মুসলমান স্বীকার করতেন না, অনেক হিন্দুও না। প্রভুত্ব লোভী পাঞ্জাবী মুসলমানের অধীনে গিয়ে এ অসম ব্যবহার পেয়ে বাঙ্গালী মুসলমান প্রথম বুঝতে পারল যে তার শক্তির উৎস, তার আত্মসম্মানের কেন্দ্র তার বাঙ্গালীত্বে, মুসলমানত্বে নয়। ঐ সময়েই কোন একজন খ্যাতনামা পূর্ব-পাকিস্তানবাসী মুসলমান লিখেছিলেন যে—আমার বাঙ্গালীত্ব আমার মুসলমানত্বের চেয়ে, এমন কি Nationaliyর চেয়ে সত্যতর।

আমি ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টান হতে পারি, আমি অন্য দেশের Nationality নিতে পারি, কিন্তু আমি যে বাঙ্গালী এ সত্যকে কিছুতে পরিবর্তন করতে পারি না। পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করে কয়েকজন বুদ্ধিজীবী এই বাঙ্গালীত্বের উপর জোর দিয়ে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে দৃঢ় করতে চাইলেন। বঙ্গ ভাষা ও সংস্কৃতি যদি বাঙ্গালীর প্রধান মূলধন হয়, যদি রবীন্দ্র সঙ্গীতই তার জীবন ও কর্মের প্রেরণা দেয়, তবে হিন্দুকে দূরে রাখা চলে না।

১৯৬৪ সাল থেকে ভারতে বসে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বসে আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী পূর্ব পাকিস্তানে এই নব জাগ্রত ভাবটিকে লক্ষ্য করলাম ও বন্দনা করলাম। এর একটা চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময়। ততদিনে বুদ্ধিজীবীরা ছাত্র-সমাজের মধ্যে এমন একটা জনমত সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যাতে করে ঐ দাঙ্গায় বাঙ্গালীরা যোগ দিল না। উপরন্তু হিন্দুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণও দিল। এরকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা দু দেশেই কিছু কিছু ঘটেছে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এই প্রথম দাঙ্গা রোধের চেষ্টা দেখা গেল ও হিন্দুদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিরও আভাস পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য এই সংবাদে পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র ভারতে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, যে যুক্তির উপর নির্ভর করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, এই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক আন্দোলন তার গোড়া ঘেঁষে আঘাত করেছে, এবার তা ভেঙ্গে পড়ল বলে। বাধা দিলেই পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ ও তাদের সহকারী মোল্লারা যতই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, এদের আন্দোলনও ততই দুর্বার হল।

বাধা দিলেই বাধবে লড়াই
মরতে হবে
পথ জুড়ে কি করবি লড়াই
সরতে হবে।

এই হল সেই আন্দোলনের মূল কথা। মুসলমানের মেয়ে সিন্দুরের টিপ পরলে, শাঁখা পরলে আল্পনা দিলে। আল্পনার উপর খালি পায়ে হেঁটে শহিদ বেদীতে অর্ঘ্য দিতে গেল। এই গুলি যে হিন্দুয়ানী ভাবের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তাতে সন্দেহ নেই। পাকিস্তানীরা যে চোখ রাঙ্গাবে সেটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমান আর সে ভয়ে ভীত নয়। সে বলে সিঁদুরের টিপে ধর্ম কোথায়, রবীন্দ্র সঙ্গীতে বা জাত যাবে কেন? এগুলি বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অঙ্গ, এর উপর জুলুম চলবে না। লড়াই-এর এই ত একটা দিক, আর একটা অর্থনৈতিক। ইসলামাবাদের ঐশ্বর্য ও পূর্ব পাকিস্তানের দৈন্য একটা ঈর্ষাকাতর দৈন্যভাব সৃষ্টি করবে, এটা আশ্চর্য নয়। গোলমালটা জমে উঠল। স্বভাবতঃই ভারতের হিন্দুর ও পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালীর মন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙ্গালীর দিকে একতরফা রায় দিয়ে বসেছিল। তার প্রধান কারণ, এই স্বন্দের মধ্যে এই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক একটা রাজনীতির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কতদিন পরে হিন্দু-মুসলমান এক হচ্ছে। এই আশার সংবাদে সকলেই মনে করছিলেন যে বাঙ্গালীর জীবনে এক নূতন সূর্যোদয় পূর্ব-পাকিস্তানে ঘটবে। কিন্তু দূর থেকে এই অসাম্প্রদায়িকতাকে আমরা যতদূর গভীর ও ব্যাপক মনে

করেছিলাম, হয়ত বাস্তব ক্ষেত্রে ততটা ছিল না। স্বার্থের সংঘাতের সময় ওটা একটা প্রয়োজনীয় অস্ত্র হয়েছিল অনেকের পক্ষে। সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরে যে অন্য মূর্তি বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয়, সেটা আমরা উৎসাহের ঝোঁকে এদিকের বাংলায় বসে ভাবিনি। যদিও আবার বেশীর ভাগ লোকই একেবারেই বিশ্বাস করতেন না যে পূর্ব পাকিস্তানে এ ধরনের অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন একেবারেই সম্ভব। ২৫শে মার্চের পর থেকে যখন দলে দলে হিন্দু-মুসলমান ভারতে আশ্রয় নিতে ছুটে এলো, তার আগে অনেকেই বিশ্বাস করেন নি যে বাঙ্গালী মুসলমানের ভাব ও ভাবনার কতখানি পরিবর্তন হয়েছে।

আজকে বাংলাদেশে অনেকে বলেন, শুনতে পাই যে ভারতের সরকার নিজের স্বার্থের জন্যে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছেন। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁরা শুধু রাজনীতির প্যাঁচকেই চেনেন, মানুষকে চেনেন না। ভারতীয় সরকারের কি উদ্দেশ্য ছিল তা জানি না, তবে এটা নিশ্চয় সত্য যে কোনো সরকারই তার নিজের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করার জন্য কোটি কোটি টাকা, অস্ত্র-শস্ত্র ও মানুষ খরচ করবে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের সরকার এমন কোনও কাজে লিপ্ত হতে পারে না যেটা তার জনগণের ইচ্ছার বিপরীত। বস্তুতঃ কি ঘটেছিল? সরকার এগিয়ে যাবার আগেই মানুষ এগিয়ে গিয়েছিল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন, সারা ভারতেই বাংলাদেশের জন্য কে কতটা কাজ করতে পারে তার যেন একটা প্রতিযোগিতা চলেছিল। যে সমস্ত যুবকেরা অলসভাবে রোয়াকে আড্ডা দিয়ে কাটাত, ক্যাম্পে ক্যাম্পে দেখেছি তাদের দিন রাত্রের পরিশ্রম। যারা সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলত, দেখেছি—তাদের পরিবর্তিত রূপ। "ও জাতকে বিশ্বাস নেই" —এ কথাটি আর বলতে পারছে না কেউ। যে জন্য পাকিস্তান শত চেষ্টা সত্ত্বেও দাঙ্গা লাগাতে পারল না। এক হাঁটু জল কাদার মধ্যে গিয়েছে তারা—যারা কোন দিন মোজেয়িকের মেঝেতেও পায়ের চটিটি খোলেনি। কিন্তু এই যে দেওয়া—একি বাংলাদেশকে দেওয়া, বাংলাদেশের কয়েকটি বিপন্ন মানুষকে দেওয়া? তা নয়। নিজেদের মধ্যে যে আদর্শটি ছিল, তারই উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দান। হিন্দু-মুসলমান এক হচ্ছে আজ যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে—আর সে ফিরেছে কিসের ডাকে? মায়ের ডাকে বঙ্গভাষা জননীর ডাকে। বিচ্ছেদের ব্যথায় আর্ত বাঙ্গালীর মনে এর চেয়ে আর আনন্দদায়ক ঘটনা কি হতে পারে? সে ভাবছে এই ত সব মিলে গেল —"ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে?"

উৎসাহ এত বেশী হয়েছিল বলেই, আজ কিছুটা আঘাতের সম্মুখীন হতেই হবে। একটা উত্তেজনার মুহূর্তে মানুষের মন যে উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকে, সে সুর কিছুটা নেমে যেতে বাধ্য। যে জোয়ার এসেছিল তার জল নেমে গেছে। কিছুটা কাদা বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ এটা স্বাভাবিক ঘটনা।

বর্তমানে ভারতে একটা প্রশ্ন সকলকে উদ্বিগ্ন করেছে—বিশেষ করে যারা বাংলাদেশের কাজে খুব বেশী জড়িয়ে ছিলেন—সময়, অর্থ ও পরিশ্রম দিয়েছিলেন, তাঁরা ভাবছেন আমাদের কাছ থেকে এত পেয়েও এরা অকৃতজ্ঞ হচ্ছে কেন? এঁটো হাত শুকতে না শুকতে নিন্দা করে কি করে? এ কথা জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত

নয়। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে দাতার পক্ষে কৃতজ্ঞতা আশা করার মত বিড়ম্বনা আর কিছু নেই। সেই দাতা যে দানের মধ্যেই নিজের সার্থকতা পেয়েছে। ভারত যদি এক কোটি লোককে আশ্রয় দিয়ে থাকে, সাত কোটি লোককে নরপশুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরে থাকে, তা হলে তার সার্থকতার স্বর্গ তার কর্মের মধ্যেই, তার বাহিরে হাত বাড়াতে যাবার দরকারই নেই। ব্যক্তির জীবনেও তাই, সমষ্টির জীবনেও তাই। কৃতজ্ঞতা শব্দটা তাইতো একটা নিরর্থক শব্দ। তবু যদি আমরা ধরে বসে থাকি কৃতজ্ঞতা আমরা চাই-ই চাই, আমাদের সেটা প্রাপ্য, তা হলে ভেবে দেখা যাক কারণটা কি, কৃতজ্ঞতা কেন পাচ্ছি না।

প্রথমতঃ, সাড়ে সাত কোটির মধ্যে মাত্র এক কোটি শরনার্থী এদেশে এসেছিল, তার মধ্যে ৭০ ভাগই হিন্দু। বলাবাহুল্য হিন্দুরা ভারত বিরোধী নয়। দু একজন লোক দেখান ভাব করলেও সেটা সত্য নয়, হতে পারে না। সাধারণ শরণার্থী ছাড়া, মুক্তি ফৌজের যারা এখানে শিক্ষা দিচ্ছিলেন ও গেরিলাযুদ্ধে যাচ্ছিলেন, তাঁদের কিছু কিছু লোকের মধ্যে অসন্তোষের ভাব ও অবিশ্বাসের ভাব আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। গত ২৫ বছর ধরে পাকিস্তান যে ভারত বিদ্বেষ শিখিয়েছে, বেকায়দায় পড়েছে বলেই তা সহসা তাদের মন থেকে উপে যাবে এটা আশা করা অসঙ্গত। মুক্তি ফৌজরা শিক্ষা দিচ্ছিলেন, গেরিলাযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন, কিন্তু সন্দেহ তাঁদের ছাড়ছিল না। তাঁরা ভাবছিলেন—"ঠিকমত অস্ত্র-শস্ত্র দেবে ত? ঠিকমত শেখাবে ত?" কেউ বা দু চারবার বন্দুক চালিয়ে নিজেদের খুব দক্ষ সেনাপতি মনে করে বসেছিলেন।

"আমার নাম তোমার নাম
ভিয়েৎনাম, ভিয়েৎনাম"।

যথেষ্ট গোলাগুলি পেলেই পাকিস্তানী সৈন্যদের বিতাড়ন করতে দেরী হবে না—এই ছিল অনেক বালক ও সেকটর কমাণ্ডারদের মনের ভাব। এদিকে ভারত সরকারও কি করে উপযুক্ত শিক্ষা হবার আগে বা প্রকাশ্যে প্রচুর ও প্রভূত অস্ত্রশস্ত্র দেয়? চারিদিকে ছিদ্রান্বেষী শত্রু ওৎ পেতেই বসেছিল, সমস্ত যুদ্ধের দায়িত্ব ভারতের ঘাড়ে চাপাবার জন্যে। এমতক্ষেত্রে মুক্তি ফৌজদের ও তাদের কমাণ্ডারদের সকল বাহানাক্কাই মেটাবার সাধ্য সম্ভব হয়নি। মুক্তি ফৌজের একটা বিরাট দল তাই আগে থেকেই অর্থাৎ এদেশে থেকেই সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষ করে "মুজীব বাহিনী" তৈরী হবার পর আওয়ামী লীগ বহির্ভূত সকলেরই মনেই একটা আশংকা দানা বাঁধছিল। অনেকেই তখন বলতেন—ভারত সরকার আওয়ামী লীগকে এই মুজীব বাহিনী তথা ফ্যাসিষ্ট বাহিনী তৈরী করে দিচ্ছেন। যুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে যখন অন্য সকলকে অস্ত্র রেখে দিতে হবে, তখনও এই "মুজীব বাহিনী" অস্ত্র ঘোরাবে ও আওয়ামী লীগের পালিত গুণ্ডা বাহিনী রূপে কাজ করবে। এই আশংকার কথা তখনই অনেক শুনেছি। কিন্তু এটা যে সর্বৈব মিথ্যা কথা তা আজ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। যে সব লোক দেশের ভিতরে ছিল, যারা ভারতে আসেনি তারা পাকিস্তানীদের অত্যাচারে অনেকেই জর্জরিত হয়ে ভারতের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে ছিল বটে, কিন্তু তারা তাদের এত দিনের ভারত বিদ্বেষের শিক্ষা একেবারে ভুলে গিয়েছিল তা বলা যায় না। এ ছাড়া পাকিস্থানের পক্ষে যে কত

বাঙ্গালী ছিল তারও ত ইয়ত্তা নেই—এত প্রতিকূলতা তা না হলে এলো কোথা থেকে ? এ ছাড়া আওয়ামী লীগের অনেকেই হিন্দুরা চলে আসার পর তাদের সম্পত্তি দখল করে পাকিস্তানের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। সম্পত্তির ফেরতের কথা হতে পারে না—তাছাড়া দীর্ঘদিন থেকে হিন্দুরা ভারতে চলে যায় আর কখনো ফিরে আসে না এবং তাদের সম্পত্তি প্রতিবেশীরা ভোগ করে—এটা গ্রামবাসীদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই প্রথম হিন্দুরা ফিরে গিয়ে নিজের সম্পত্তি দাবী করল। এমন ঘটনাটা ঘটতে পেরেছে ভারতের জন্য। কাজেই পরস্ব অপহারী মুসলমানেরা (যাদের সংখ্যা বিরাট) তারা ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠল। হিন্দুরা এবার যারা এসেছিল তারাও গেল তাছাড়া অনেক আগে যারা এসেছিল তারাও অনেকে ভেবেছিল যে সাম্প্রদায়িকতার কারণে দেশছাড়া হয়েছিল এখন যখন তা চুকে গেল তখন ঘরে ফিরে যাব। এই গৃহাভিমুখী হওয়াটা সম্পত্তি লোভে নয়। আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায় এমন লোককেও বলতে শুনেছি চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিয়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গিয়ে চাষবাস করবে। কিন্তু যে সব মুসলমানেরা এতদিন সেই সব পলাতক হিন্দুদের সম্পত্তি ভোগ করেছিল, তারা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, যদিও সেই আগেকার শরণার্থীরা কেউই ফিরে যেতে পারেনি—দুই দেশের সরকারই সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধি মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কার্যকরী হয়নি।

যাঁরা স্বাধীনতা চান নি, যাঁরা পাকিস্তানের পক্ষে, তাঁরা ত দেশের মধ্যে ভারত বিদ্বেষ জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা ত করবেনই এবং সে চেষ্টা অব্যাহত ভাবে চলছেই এবং তাতে ইন্ধন পড়ছে যখনই দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। অনেকে মনে করেছিলেন—স্বাধীনতা একটি সুখের বড়ি, সেটি গিললে ফেল্লেই চারিদিক থেকে সুখ সমৃদ্ধি উৎসে উঠবে। পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে দিলেই অর্থসম্পদ বেড়ে যাবে—ঢাকা হবে ইসলামাবাদ। কিন্তু এত সহজে তা হবার নয়। ভারতের অপর্যাপ্ত সাহায্য না হলে, এতদিনে যে দুর্ভিক্ষ লেগে যেত, সে কথা কেউ ভাবতেও চায় না। কারণ কি পাইনি তার হিসাব মিলান মানুষের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা পেয়েছি তা উহ্য থাক। এই যে অসন্তোষের প্রবৃত্তি আজকের দুঃসময়ে তারই উপর ভর করে পাকিস্তানের সহচররা ভারত বিদ্বেষ খুঁচিয়ে তুলছে। তারা অশরীরী ছায়া মূর্তি, ক্রমাগত কানে কানে বলছে—"এই ত হল, কি পেলে? অন্ন, বস্ত্র? পাকিস্তানের বদলে এখন ভারতবর্ষ তোমাদের প্রভু হয়ে বসল।" এই সঙ্গতে যোগ দিচ্ছে তথা-কথিত প্রগতিশীলরা—তারা পাকিস্তানের চর নয়, কিন্তু উদ্দেশ্যের মিল আছে—এরা ভাবে আওয়ামী লীগ যথেষ্ট প্রগতিশীল নয়। আওয়ামী লীগ নাকি যে চরে ভরা। যেন বিরোধী দলগুলিই সাধু-সজ্জনের আখড়া। যা হোক এ প্রসঙ্গে এ কথা বলতেই হবে যে সরকার যদি Nationalist সরকার হত তাহলে বিপদটা হয়ত একটু কম হত। মোটামুটি ব্যাপারটা এই—তথাকথিত প্রগতিশীলরা এখনো চীন ভক্ত। এই অচল ভক্তি দুর্বিপাকের সময় এত দুর্ব্যবহার পেয়েও যে বেঁচে আছে তাতে সন্দেহ হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে ভক্তির রসদ কিছু মিলছে। এদের বক্তব্য হচ্ছে এই আওয়ামী লীগ ভারত সরকারেরই প্রতিরূপ। সেইজন্যই ভারত সরকার একে পুতুল সরকার করে রেখেছে। আসল রাগটা হচ্ছে

এদের আওয়ামী লীগ সরকারের উপর, তার প্রতিচ্ছায়াটি পড়ছে ভারত সরকারের উপর। এই প্রগতিশীলেরা কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে এই ভারত বিরোধিতার সঙ্গে হিন্দু বিরোধিতা মিশে গেলেই তাদের প্রগতির প্রথম পদক্ষেপেই পাটি মচকে যাবে। কারণ সাম্প্রদায়িকতার রাক্ষস আবার জাগিয়ে তুললে, তাকে আর যা কিছু বলা যাক, প্রগতি বলা যায় না। পিছনের একটা দীর্ঘ ইতিহাস থাকার জন্য ভারত বিরোধিতা ও হিন্দু বিরোধিতা একসঙ্গে মিশে যাবেই। আজকে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বিপদ এইটেই। দেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রাখতে না পারলে পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশের মাথা হেঁট হবে এবং পাকিস্তানের আনন্দ বর্ধন করবে। সুখের বিষয় বাংলা দেশে যে ভারতবিরোধী হিস্টিরিয়া চলছে সেটা খুব গুরুতর কোনো রোগ নয়—মোটামুটি এটা যেন একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে—ফ্যাসনটা একটা কমপ্লেক্স থেকে উদ্ভূত। কমপ্লেক্সটা এই—আমি কারো ছোট নয়, কারো পরোয়া করি না। কিন্তু সবচেয়ে চড়া গলায় যারা ভারত-বিরোধী কথা বলে, তাদের ভারতে আসার মনে মনে আগ্রহ প্রবল। পাসপোর্ট ও বাট্টা—এই দুই হাঙ্গামা না থাকলে প্রগতিশীলরা বাংলাদেশের সব পার্টি ছেড়ে কোলকাতার পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলকে বেশী প্রাধান্য দিত। কলকাতার প্রতি আকর্ষণ এখনো প্রবল। নাই বা হবে কেন—সেইটাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই যে মধ্য-বয়সীদের ভারত বিরোধিতা স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত, কিন্তু নব্য ও নবীনাদের এটা একটা স্টাইল মাত্র।

বুদ্ধি ও অবুদ্ধি

এই বিচিত্র দেশের সমাজের যে কোনো দৃশ্য চোখে পড়ে দেখি এক অবিশ্বাস্য অদ্ভুতের সমাবেশ। সবচেয়ে বিস্ময়কর বোধহয় চিন্তার ও কর্মের গরমিল। শুনে থাকি ভারতীযেরা আধ্যাত্মিক ও ধর্ম-বিশ্বাস অবশ্য বিচিত্র, বহুবিধ, কখনো পরস্পর বিরোধী। কিন্তু যেখানেই কোনো দৃঢ়মূল বিশ্বাস সেখানেই আছে আনুষঙ্গিক আচার, অনুষ্ঠান। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেকখানিই বাঁধা পড়ে আছে সেই সব প্রথা সংস্কারের বন্ধনে। কিন্তু যেখানে বিশ্বাসের মূল একেবারেই শিথিল বরং বিশ্বাস অনুপস্থিত সেখানেও কেন হাজার হাজার বছরের পুরানো রীতি আঁকড়ে ধরে আমরা সমাজজীবন জঞ্জালে আকীর্ণ করে রেখেছি একথা বহুদিন ধরেই অনেকে ভাবছেন কিন্তু এই অনড় চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন দেশে সে ভাবনা কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। যদিও ভারতের প্রায় সব ধর্মসম্প্রদায়ই বুদ্ধির সতর্ক সচলতা হারিয়ে যুক্তি ও কর্মের সঙ্গে একটা বিরোধ ঘটিয়ে রেখেছে তবু যেহেতু হিন্দুসমাজের সঙ্গেই আমার সংযোগ বেশি সেজন্য হিন্দুসমাজ সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

প্রথম ধরা যাক সামাজিক উৎসবগুলির কথা—বেশির ভাগ উৎসব অনুষ্ঠানেরই মূল রয়েছে অতীতের কোনো ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে। ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা, পাপ, পুণ্য এই সমস্ত অজ্ঞেয় ভাবনাই আমাদের আচার অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের যে দশকর্ম বিধান সেগুলি

পরীক্ষা করলে আমরা দেখি যে সব বিশ্বাস বহু পূর্বে শিক্ষিত মানুষের মন থেকে ক্ষয় হয়ে গেছে বা যাওয়া উচিত ছিল, মানসিক জড়ত্ব হেতু তাদেরও স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা হয় নি। ভূত, প্রেত ও বহু আজগুবি কল্পনা, জাগতিক ব্যাপারের অতি-প্রাকৃত কারণ অনুসন্ধান, প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা থেকেই আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সব ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল তার অনেক কিছুই আজও বহাল রয়েছে।

একটি সদ্যোজাত মানবশিশুর মত দুর্বল জীব আর নেই—চারিদিকে রোগ-ব্যাধির জীবাণু ছড়ানো, বিপদসঙ্কুল এই পৃথিবীতে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কম কঠিন কাজ নয়। এক সময় যখন রোগ-ব্যাধিগুলোর কারণ ও তাদের সঙ্গে লড়াই করার উপায়গুলো জানা ছিল না তখন অনেক আজগুবি উপায় চিন্তা করা স্বাভাবিক ছিল। টিটেনাসকে পে'চোয় পাওয়া ভাবা, ষষ্ঠীঠাকরুণকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা, মা শীতলাকে পেট ভরে খাওয়ান, তখন হয়ত স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আজ যখন দেশের একটি বৃহৎ অংশ রোগজীবাণু, জাগতিক নিয়মের অমোঘতা প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, অন্তত বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তখনও কেন তারা জাগতিক ব্যাপারের আধিভৌতিক ব্যাখ্যা করতে কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। কেনই বা ষষ্ঠী, শীতলা, তন্ত্র-মন্ত্র, তাগা-তাবিজ, স্বস্ত্যয়নের কিছু মাত্র ঘাটতি হচ্ছে না। এমনকি ডাক্তারের বাড়িতে বা বিজ্ঞানের বড় বড় ডিগ্রীধারীর বাড়িতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি যা বলে তা এড়িয়ে যে সব অন্ধবিশ্বাস শিক্ষিত লোকের মনের উপরও জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রেখেছে তার ফলে তার শিক্ষা ও বিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। চিন্তার মধ্যে বহু আবর্জনা সঞ্চিত হয়ে উঠছে—ফলে তার ব্যবহার হচ্ছে অসংলগ্ন। সমস্ত সমাজের মধ্যেই বিচার-বুদ্ধিকে অস্বীকার করায় এক রকম চিন্তার উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে উঠেছে।

আজকের দিনেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবীত গ্রহণের অনুষ্ঠানটি একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান—হয়ত ৯৯টি ব্রাহ্মণ পরিবারে অনুষ্ঠান আজও সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে—অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর। কিন্তু আজকে জীবনের সঙ্গে এর সংযোগ কোথায়? কোন ব্রাহ্মণ-তনয় আজ প্রত্যূষে উঠে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবে? কেই বা ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আজকের ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে তার অন্য বর্ণের সহপাঠীর জীবনযাত্রার পার্থক্য কোথায়? তাদের স্কুল-কলেজ খেলাধূলা, চিন্তা-ভাবনা, আমোদ-প্রমোদ কোনো কিছুর সঙ্গেই আজ যজ্ঞোপবীতধারী গুরুগৃহবাসী ব্রাহ্মণ-তনয়ের কোনো সাদৃশ্য নেই, থাকতে পারে না। যদি কোনো আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ধর্মভাবনার প্রয়োজন আজ থাকে তবে তাকে বর্তমানের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই তা অর্থবহ হয়। 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলে আজকের সদ্য দ্বিজত্বে উপনীত বালক কোন আদর্শের প্রেরণা লাভ করছে? সে কি মাধুকরী বৃত্তিকে করণীয় মনে করবে? সে কি যজ্ঞোপবীত পরিধান করে যজ্ঞ করবে কখনো? আজকের মানুষের কাছে যাগ-যজ্ঞর কি কোনো অর্থ আছে? তবু যে কতগুলি রীতি পালন গতানুগতিক পথে চলেছে এর দ্বারা এদেশের মানুষের কল্পনাশক্তির অভাব ও বিচারবুদ্ধির দৈন্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

কেউ হয়ত তর্ক তুলবেন যে এগুলি সামাজিক উৎসব মাত্র। এবং মানুষের

জীবনে উৎসবের প্রয়োজনীয়তা আছে। উৎসব হচ্ছে মানুষে মানুষে মিলবার একটা উপলক্ষ্য। সেইজন্যই উপলক্ষ্যগুলির যদি তাৎপর্য থাকে তবেই তা উন্নততর মহত্তর আনন্দে জীবনকে পূর্ণ করতে পারে। যে আনন্দ সকল মানুষের উপভোগ্য আজকের উৎসবে তাকেই খুঁজে পেতে হবে। বিগত দিনের পুরানো রংচটা আসবাবে ঘর সাজালে যেমন তার শোভা হয় না তেমনি এককালে যা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন তেমনি কতকগুলি অভ্যস্ত কর্ম দিয়ে আজকের উৎসব সার্থক হয় না। বিবাহ ব্যাপারটাই ধরা যাক না—সাধারণতঃ বাঙালি হিন্দুর বিবাহ উৎসব তো কখনো কখনো কষ্টকর আতিশয্যের পর্যায়ে পৌঁছায়। সাধ্যের অতিরিক্ত জনসমাগম ব্যবস্থা কখনো কখনো সমগ্র আবহাওয়া ক্লেদাক্ত করে তোলে। এ ছাড়া বিবাহ পদ্ধতিটাও হয়ে দাঁড়িয়েছে কতগুলি অর্থহীন অসংলগ্ন ঘটনা সমষ্টি। এত সুন্দর যে বরবধূবরণ তার সৌন্দর্যটা ফুটিয়ে তোলার কোনো সুব্যবস্থাই হয় না। ভিড়ের চাপে কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক বস্তুর স্তূপে বরণডালার সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যায়। সাজান সুন্দর বিবাহমণ্ডপে পাট-কাঠির ধোঁয়ায় চোখের জল ফেলে বরবধূ যে মন্ত্রোচ্চারণ করেন তার অল্পই তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়। আজকের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ক'জন চিন্তা করেন মন্ত্রগুলি কি বলছে—বা এই ঘৃতে আহুতির অর্থ ও তাৎপর্য কি? একটি দাক্ষিণালোভী পুরুতের ভুল উচ্চারণে উচ্চারিত দুর্বোধ্য কতগুলি শব্দই আজকের অধিকাংশ নর-নারী জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে নির্বোধভাবে গ্রহণ করে। যজ্ঞকর্মের তাৎপর্যই বা কি? ধর্মপত্নীর সঙ্গে পতি একত্রে ধর্মকর্ম করছে—আজকের মানুষের কাছে ধর্মকর্ম কি আগুনে ঘি ও খৈ ঢালা? আজকের মানুষ এ সব ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী নয়—জীবনের কোনো সময়ই যজ্ঞ করা তার কাছে ধর্মচর্চা নয়। আজকের মানুষ ন্যায় নীতির অনুশীলন ও পরহিতকর কর্মের মধ্যে মানবধর্মের সার্থকতা খোঁজে। কোনো পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নের ছাত্র কি আজ বিশ্বাস করতে পারে যে যজ্ঞ করে কোনো পুণ্য লাভ বা কোনো অঘটন ঘটনা যথা? বৃষ্টি, ফসল, সন্তান বা অন্য কোনো বস্তু ঘৃতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞফলরূপে লভ্য হবে এ কি আজকের সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করতে পারে? অথচ তারা নির্বিচারে বিবাহের মত জীবনের একটি গভীর অভিজ্ঞতায় প্রবেশের মুখে ছেলেখেলার মত কতগুলি কাজ করে যায়—যা তাদের যুগ্ম জীবনের আবেগ অনুভূতি ও আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগহীন কখনো বা বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর ঘটনা।

শুভদৃষ্টির মত একটি সুন্দর সরস অনুষ্ঠানের কবিত্ব কেনই বা পিঁড়ির উপর দোদুল্যমান অবস্থায় সার্কাসের আঙ্গিকে ঘটান হয়? কেনই বা কনকাঞ্জলির মত লজ্জাকর একটি প্রথা আজও অসঙ্কোচে চলে আসছে—এক থালা চাল মায়ের আঁচলে ঢেলে দিয়ে মাতৃঋণ শোধ করার মত কুৎসিত প্রথা আসন্ন বিচ্ছেদবেদনার মধ্যের মাধুর্যটুকু নিঃশেষ করে নিষ্ঠুরতায় পরিণত করে মাত্র।

সত্য বলতে কি আমাদের অধিকাংশ উৎসব প্রভৃতির মধ্যে রমণীয়ত্ব সৌন্দর্যবোধ ও সৌকুমার্য নেই—যদিও এমন চিহ্ন আছে যাতে মনে হয় একদিন হয়ত তার কোনো কোনো আঙ্গিকে রসের মধুরের ছোঁয়া ছিল। বিবাহের এমনি একটি সুন্দর অঙ্গ অরুন্ধতী দর্শন। জীবনের এক পরম লগ্নে দুজন মানুষ একত্র জীবনযাত্রা শুরু

করবার মুহূর্তে উন্মুক্ত মহাকাশের নিচে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বমুখী হওয়াই একটি সুন্দর ঘটনা। বিশেষত যখন কয়েকদিন ধরে অজস্র বিবিধ খুঁটিনাটিতে আচার-ভীরু মনে কোনো বিরাট অনুভূতির পথ কণ্টকাকীর্ণ।

এমনি আর একটি সুন্দর প্রথা ছিল মুমূর্ষুকে মৃত্যুর পূর্বে খোলা আকাশের নিচে নিয়ে আসা। জীবনের একটি পরমক্ষণ মৃত্যু—অনন্তের সঙ্গীত শোনবার মুহূর্তে বদ্ধ ঘরের কপাট খুলে তাকে আকাশের মহিমার মধ্যে নিয়ে আসা—এমন সুন্দর ও সঙ্গত ভাব আমাদের প্রথাগুলির মধ্যে কমই আছে।

এর কার্যকরী দিক অক্সিজেনের অভাব পূরণ। নানা কারণে এ প্রথা এখন অচল হয়েছে। তাতে ক্ষতিও নেই। কিন্তু দাহকর্ম? একদা নদীর তীরে আগুনের শিখায় প্রিয়জনের শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে দিয়ে শোকার্ত আত্মীয়কুলের যে শ্মশান-বৈরাগ্যভাব তার মধ্যে বেদনামথিত আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলার একটি আশ্চর্য প্রথা ছিল এই দেশে। কিন্তু শ্মশান আজ পাগল কুকুরের বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে যখন সব গাম্ভীর্য ও মহিমাভ্রষ্ট হয় তখন আমাদের সমাজের কোথাও আঘাত লাগে না। মানুষের চির শান্তির ক্ষেত্র আর্ত আত্মীয়স্বজনের গভীরতম উপলব্ধির স্থানটি পূজার মন্দিরের মত পবিত্র, সেখানে আমরা অনায়াসে কুৎসিতকে জায়গা ছেড়ে দিই আমাদের তাতে কোনো বেদনা বাজে না।

আর পূজার স্থানই বা কি? হিন্দুর পরম তীর্থ কালীঘাটের মন্দির কি জল-কাদা রক্তে এক নারকীয় বীভৎসতা সৃষ্টি করে আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে নেই? ইংরেজিতে একটা কথা আছে cleanliness is next to Godliness—সে প্রবচনের অবশ্য বাংলা হয় না—আমরা চিন্তাও করি না যে অপরিচ্ছন্ন ক্লিন্ন আবহাওয়ায় কোনো উচ্চ মহৎ সুকুমার উপলব্ধি ঘটতে পারে না। পূজার আয়োজনে আছে ধূপ ধুনা পুষ্প চন্দন—কিন্তু আজ এ উপাচারগুলি তাৎপর্যভ্রষ্ট—বিচ্ছিন্ন কতগুলি বস্তু মাত্র। তা দিয়ে কোনো স্তবগান বেজে উঠছে না। বিচ্ছিন্ন শব্দে যেমন গান নেই—তেমনি বিচ্ছিন্ন কতগুলি সুন্দর বস্তুর অসমঞ্জসা সমাবেশে তেমনি সৌন্দর্য নেই—জল কাদা ও মনুষ্য ক্লেদে পূর্ণ আবহাওয়ায় তা বিকারগ্রস্তের হাসির মত তাম্রপটের উপর পড়ে থাকে।

সব চেয়ে দুর্বোধ্য লাগে আমাদের শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়া। পরমপ্রিয় যে মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতে চাই যার দেহহীন অস্তিত্বের চিন্তা আমাদের বিরহকাতর মনে নানা গভীর প্রশ্ন ঘনিয়ে আনে। জন্মমৃত্যুর অপার রহস্যর সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমরা এক নিগূঢ় অপ্রকাশ্য অনুভূতিতে মৃত্যুর মহিমা উপলব্ধি করি সেই সময়ে আমাদের শ্রাদ্ধ বাড়িটি কল্পনা করুন। খুঁটিনাটি তুচ্ছ দ্রব্যের আয়োজনে সাজানো উপাচার—বস্তুহীন উদার অনুভূতির প্রতিবন্ধক মাত্র। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠে সব শব্দ ছাপিয়ে যা বার বার কানে আসে তা হচ্ছে অমুক প্রেতের শুভ কামনায় বা স্বর্গ বাসেপার ব্রাহ্মণায় দদামি। কেন ব্রাহ্মণকে দিলে অমুক প্রেতের শুভ হবে কেই বা তা ভাবছে? কেই বা না জানে চতুর ব্রাহ্মণের রোজগারের এটি কায়েমি ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণশ্রেণীর পৈতৃক পেশাটি রক্ষার জনাই যে অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্ম তা 'ব্রাহ্মণায় দদামি' থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লোকান্তরিত পরমপ্রিয় ব্যক্তির কোনো সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করতে আমাদের নিঃসন্দেহে ভাল লাগে তার কোনো

বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণথাকুক বা না থাকুক—যারা বর্তমান আছে তাদের কাছে সেই ভাল লাগাটুকুই অসীম মূল্যবান—সেজন্য এই কল্পনার মধ্যে একটি সত্য আছে—সে সত্যার কোনো বাস্তবতা সম্ভবত নেই তবু তা জীবনের বেদনার পাত্রে অনুভূতির গভীরতায় এক বিশেষরূপে সত্য। কিন্তু সেই সত্তাকে প্রেতরূপে কল্পনা করে তার উদ্দেশ্যে আলোচাল ও কাঁচকলা সিদ্ধ চটকে পিণ্ডদান করার মধ্যে যে বীভৎসতা আছে তা আমাদের সমস্ত সুকুমার ভাবনার উপর একটি স্থূল হস্ত বুলিয়ে দেয়। এই যে প্রেতরূপে কল্পনা করে আত্মার স্বর্গ কামনায় পুরুৎকে দান এ-কাজ তো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা বৈজ্ঞানিকরাও করে থাকেন—তাঁরা কি বিশ্বাস করেন যে ঐ পুরুৎকে ঘটি বাটি খাট পালং দিলে তবেই তাঁদের পিতা মাতার অক্ষয় স্বর্গবাস হবে? স্বর্গ কোথায় এবং সেখানকার পথঘাট ঐ ব্রাহ্মণের সন্ধানে আছে একথা আজকের দিনে কোনো বয়স্ক ব্যক্তি মনে করে না অথচ যে সামাজিক কর্মগুলি পাঁচজনের সঙ্গে একত্র উদ্‌যাপন করা হয় সেখানে অনায়াসে এমন সব আজগুবি কল্পনার স্থান থাকে যাকে ছেলেমি বললে অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতার ক্ষণগুলি আমরা এইভাবে অবাস্তব ভুতুড়ে কল্পনার খোঁয়াড় বানিয়ে রেখেছি যেখানে জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে বুদ্ধি বিচার সৌন্দর্যবোধ কল্পনা-শক্তি সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে বসে অতীত গৌরবের স্বপ্ন দেখছি।

আমাদের সমাজজীবনে, প্রতিদিনের জীবনে, গুরু-পুরুতের হাতে পোঁতা এই সব বহু বিচিত্র আড় খুঁটি গাঁথা আছে—যেগুলিকে নির্বিচারে মেনে নিতে, যার কাছে নিজের বিচার বুদ্ধিকে খণ্ডিত করতে, আমাদের এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না। শুধুই যে মনের অনড়ত্ব এর কারণ তা নয়, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে শাস্ত্র-বাক্যের উপর বিশ্বাসপ্রবণতাই এর মূল, তা সে শাস্ত্র মনু-পরাশরের তৈরিই হোক বা ঠাকুমা দিদিমা-র তৈরিই হোক! অথচ আজ থেকে একশ' বছর আগেই এদেশের মানুষ বুদ্ধির চর্চা করতে শুরু করেছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকেই খুঁটি-গুলিকে নড়িয়ে দেওয়ার কাজে তাঁরা কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্মগুলিকে ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্যভাবে বুদ্ধিগম্যভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল—দুঃখের বিষয় সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সেখানেও দেখা দেবার ফলে তা সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাকে নতুন রূপ দিতে পারে নি। তার প্রভাব খুব একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত থেকে অনেক সম্ভাবনা বিফল হয়েছে তা না হলে হিন্দুসমাজের মধ্যে আজকের প্রচলিত পূজারীতি এমন উচ্ছৃংখল ছেলে-খেলা হয়ে উঠতে পারত না। দেবতার নামে এমন পুতুল খেলা পুণ্য ভারতের আধ্যাত্মিক জাতির মধ্যেই উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেছে। এই পূজা পদ্ধতি আজকের মানুষের মনের কোন ভাবনা স্পর্শ করতে পারে না যতই না কেন প্রতিমার প্রতীকত্ব নিয়ে তত্ত্বকথা বলা হোক। সে তত্ত্ব আজকের চোঙা প্যাণ্ট পরা টুইস্ট নাচিয়ে নবযৌবনের মর্মে প্রবেশ করতে পারে না। পরিবেশভ্রষ্ট এক প্রাগৈতিহাসিক পূজা আয়োজন আজ কেবলমাত্র প্রমোদোৎসব ছাড়া কিছু নয়। তর্কের খাতিরে একথা বলা চলে যে এতে ক্ষতিই বা কি আজকের নিরানন্দ জীবনে যেটুকু উৎসবের গান বাজে তাই লাভ। কিন্তু পূজার প্রয়োজনীতা যাঁরা মানেন

তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে পূজোকে খেলা করে ফেলা একটি মানবিক শূন্যতা—জীবনের যে দিকটি গভীরের প্রতি, অন্তরের প্রতি অমর্ত্যের উন্মুখ সেই দিকটিকে প্রতিদিন সত্য করে তোলার সাধনা মনুষ্যত্ব লাভের একটি প্রধান উপায় সেই দিকটিই তাই এমন পঙ্গু বঞ্চিত ও খেলো করে রাখায় ক্ষতি বৈ লাভ নেই। সারা জীবনের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে এমন ব্যাপক অবুদ্ধির চাষ মনুষ্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হতে পারে না। প্রতিদিনের জীবন ব্যাপারে যদি মান্ধাতার আমল চলতে থাকে তাহলে রাষ্ট্র ব্যাপারে যে সে আধুনিক ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠবে এটা আশা করা যায় না। সমাজ বিজ্ঞান অর্থনীতি ও সব রকম জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রই তাই যুক্তিতর্ক বিচারের মুক্ত ক্ষেত্র না হয়ে আধিভৌতিক আধিদৈবিকের অঙ্গরাজ্য হয়ে থাকে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা বিশ্বকর্মা পূজা করে, ইঞ্জিনে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়, ল্যাবরেটরির ভিত্তি স্থাপনে দিনক্ষণ শুভ লগ্নের অপেক্ষায় থাকে, পূজা-পাঠ হয়।

বলা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক যদি বিজ্ঞানের বিদ্যাটা জানে অথচ দেশের আচার-গুলিও মানে তাতে ক্ষতি কি। ক্ষতি এই যে একই সময়ে বুদ্ধির ও অবুদ্ধির চর্চা চলতে পারে না। অতএব যত ডিগ্রীধারী হয় তত বৈজ্ঞানিক হয় না। আর সমাজের সর্বক্ষেত্রেই শাস্ত্র শাসন দৈব গুরু ও অতি-প্রাকৃতের উপর নির্ভর হলে জাতি আত্মনির্ভর হতে পারে না। তারা তাই রাজ্য শাসনের উচ্চ কর্তৃত্বে থাকলেও অন্তরে স্বাধীন হতে পারে না। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরাধীনতার চেয়েও বুদ্ধির এই দাসত্ব মানব মুক্তির অন্তরায়। আমাদের সমাজ আজও নানাবিধ প্রথা সংস্কারের ছোট ছোট বেড়ায় বাঁধা এক-একটি কারাগারে মানুষকে বন্দী করে রেখেছে। মহামানবের সাগরতীরে মানুষের মিলন সঙ্গীত ধ্বনিত করবার পক্ষে তা অন্তরায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্র ও আচারের এই খুঁটিগুলি পরস্পরের মেলাবার পথে কণ্টক—কারণ যে যার নিজের খুঁটি ও শৃঙ্খলগুলিকেই মুক্তির সোপান, শাশ্বত এবং অভ্রান্ত ধরে নিয়ে নিশ্চিন্তে আছে। যেসব সামাজিক আচার ব্যবহারের ধর্মের সঙ্গে যোগ—সেগুলো তাই আরো বিশেষভাবে সতর্ক বুদ্ধি বিচারের অপেক্ষা রাখে। বহু ধর্মমতে বিভক্ত এই দেশে মানুষের মিলবার পথে কাঁটার চাষ চলেছে দীর্ঘদিন ধরে—এখন এ সম্বন্ধে কিছু কর্তব্য আছে শিক্ষিত মানুষদের।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ রয়েছে কিন্তু রবীন্দ্র পূজায় আমাদের যত আগ্রহ তাঁর বাণীতে কর্ণপাত করায় তত নয়।

…"তারাও (ডিগ্রীধারী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও) উচ্ছৃংখলভাবে যা-তা মেনে নিতে প্রস্তুত, অন্ধ ভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে : আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের লজ্জা নেই। তারাও নিজের বুদ্ধি বিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না। আরাম বোধ করে। তার একটা প্রধান কারণ এই যে মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিসটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত ভাবের উপর আস্থাবান নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেছে সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও

সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রণালীর দোষে একে তো শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সংকীর্ণ এইজন্যে সর্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে আত্মশক্তির দিকে উন্মুক্ত করে রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস এ চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তারপরে অশিক্ষিতের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে তাঁরা আপন অন্ধ বিশ্বাসে বিনা দ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিঙের ঘুমোই। আমরা কুতর্ক করে লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ববশত যে কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্বের বিষয় করে দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতি জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে, একথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে ঠেকে যে, একে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে মন রাজী হয় না।

দেশের মুক্তির কাজটা খুব বড়ো অথচ তার উপায়টা খুব ছোট হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতরই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির 'পরে বিশ্বাস। বাস্তবের 'পরে নয়, নিজের শক্তির 'পরে নয়।"

অপসংস্কৃতি

আজকাল সাহিত্য শিল্প সব ক্ষেত্রেই দুটো কথা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে এক অপসংস্কৃতি অন্যটি সাহিত্যে সমাজচেতনা। দুটি নিয়েই সামান্য আলোচনা করব। যে সংস্কৃতি অর্থাৎ যে সাহিত্য শিল্প বা নাটক মানুষকে উন্নত না করে ক্রমেই তার চিন্তায় মননে জীবন বিন্যাসে কুৎসিতের প্রাধান্য বাড়িয়ে তোলে তাকেই আমরা বলব অপসংস্কৃতি। এসব ব্যাপারে মুস্কিল এই যে কোনটা সুন্দর কোনটা কুৎসিত সে বিষয়ও কোন একটা স্থির কোন মানদণ্ড নেই। আসলে সে মানদণ্ড থাকে পাঠকের অন্তরে—। যেহেতু মানুষের শিক্ষা পরিবেশ ঐতিহ্য সবটা নিয়েই একটি মানুষ। তাই তার ভালো লাগার মনোযন্ত্রটিও পৃথক। বিভিন্ন মানুষ বাহ্যিক আকৃতিতে যত পৃথক অন্তর প্রকৃতিতে বোধহয় তার চেয়েও বেশী।

তবু আমরা এক এক যুগের ভাবনার মধ্যে একটা সমতা পাই। সমস্ত সমাজের গতি ও প্রকৃতি সমসাময়িক সংস্কৃতির চরিত্রকে প্রভাবিত করেই।

আজকের দিনে অপসংস্কৃতি অর্থে সাহিত্যে যৌনতার তান্ডবের কথাই প্রথম মনে হয়। সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই উন্মোচিত যৌনতার আকর্ষণে উন্মত্ত। এদিকে মোড়ে মোড়ে নাইট ক্লাব, ঘরে ঘরে অসংস্কৃত জীবন। বার বার জোড় বদল-সাহিত্যে তাই এরই ছায়া অতীকৃত। শত শত বই প্রকাশিত হচ্ছে যা মানুষের মনকে কোন গভীরের দিকে নিয়ে যাবে না। যা কেবলি আমোদ প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতা কিংবা জীবনের সেই দিকেরই কারবার করে যা ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী। যা আমাদের কোন অতিন্দ্রীয়ের আস্বাদ দেয় না। কিন্তু সমাজ জীবনে যে ভাবের

প্রাবল্য সাহিত্যে যেনো জলের মত তা ঢুকবে এবং যেহেতু এযুগে ব্যবসায়ের জগতেরই আধিপত্য সেহেতু বাজারের প্রভাব থেকেও সে মুক্ত হবে না। এটা ধরেই নেওয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ মনে করা যায় আজকাল সাময়িক পত্রের হাটে বিশিষ্ট খ্যাতি সম্পন্ন সাহিত্যিকদের ভূরি ভূরি রচনা বুদবুদের মত ভুস ভুস করে ওঠে তার মধ্যে এমন কিছু কদাচিৎ থাকে যা মানুষকে পথ দেখাবে বা এমন কিছু আস্বাদ দেবে যা তার প্রত্যহের জীবনের মলিনতা বা শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি থেকে মুক্তি দেবে।

কিন্তু যদি আমরা বলি সাহিত্যে বাস্তবতাই আমাদের কাঙ্খিত। আমরা গজদণ্ড মিনারের কল্পনা বিলাস চাই না—আমরা প্রত্যহ যে সব দুঃখ কষ্ট মালিন্য যে সমস্ত নিষ্ঠুর বঞ্চনা, ঘৃণ্য হিংসার সম্মুখীন হই সাহিত্য তাই তো আমাদের দেবে? অনেকে বোধহয় এই ভাবের থেকেই—সাহিত্যে কদর্যতাকেই প্রাধান্য দিতে আগ্রহী হন।

কিন্তু যেমন অবাস্তব আকাশী ভাবনা অনেক সময়ই বিফল শিল্পের জন্ম দেয় তেমনি সাহিত্যের কাছে শিল্পের কাছে, মানুষের অনেক প্রত্যাশাও আছে। সে প্রত্যাশা বোধহয় ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাশারই তুল্য এবং তেমনি দুষ্প্রাপ্য।

সাহিত্যে আমরা কেবলি দৈনন্দিন ক্লিন্নতারই অবিকৃত রূপ দেখতে এবং সেই কাদায় গড়াগড়ি দিতে চাই না আমরা চাই তার থেকে উত্তরণ। প্রতি মানুষের জীবনে ক্ষণে ক্ষণে এই উত্তরণ ঘটে আবার ক্ষণে ক্ষণেই পতনও আছে। যে বেদনায় মাধুর্য আছে, যে সুখ-স্মৃতি অক্ষয় যে দুঃখ দহনে জীবন পবিত্র, যত দীনই হোক প্রত্যেক মানুষই কখনো কখনো তার সন্ধান পায় স্পর্শ পায় কিন্তু সেই বোধ সেই উপলব্ধি জীবনে মূল বিস্তার করে না—সে ক্ষণে ক্ষণেই উড়ে যায়। জীবনের বিষ বাষ্পে পুড়ে যায়। তবু সাহিত্যে যখন আমরা তার ছোঁয়া পাই তখনই আমাদের মন উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু' মানুষ লাখ লাখ যুগ বাঁচে না—লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখতে পারে না কেউ। এ এক অবান্তর উক্তি—কিন্তু যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষের মনে এই অসত্য উক্তি এক আশ্চর্য সত্য অনুভূতি জাগিয়েছে যা আহার বিহারের সত্যর চেয়ে উজ্জ্বলতর। এই বস্তুর বাস্তবতা বর্জিত হয়েও শূন্য গর্ভ নয়। জীবনে যা পায় মানুষ কাব্যে সাহিত্যে যে তারই অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখতে চায় তা নয়। যা পেয়েও পায় না। যা ধরি ধরি করে ধরা যায় না। তারই আভাস পেয়ে আনন্দিত হয়।

সাহিত্যের কাছে মানুষের অনেক প্রত্যাশা। প্রধান প্রত্যাশা সে নন্দিত করবে। সে আনন্দিত করবে। খুশী করবে। অর্থে জ্ঞানে কর্মে ও বিত্তে যে সুখ পাওয়া যায় না তেমনি সুখে, তেমনি মাধুর্যে জীবন পাত্র ভরে দেবে।

বস্তুত সাহিত্যকে দিয়ে অন্য কোন কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে না। সে কারু দাস্য করবে না—সে মানুষের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিগুলিকে পূর্ণ করবে, তাকে আরো একটু বেশী মানুষ করবে। যে মানুষ সাহিত্য পড়েছে তার উপলব্ধির জগতে রৌদ্র আরও উজ্জ্বল, জ্যোৎস্না আর ও স্নিগ্ধ হবে। তবে একথাও অবশ্যই মানতে হয় যে যত বিশ্ব বন্দিত কর্তব্যই হোক না কেন তার মধ্যে লেখকের নিজস্ব মত

বিশ্বাসের অভিব্যক্তির উপরই মূল্য নির্ভর করে। যত সুখপাঠ্য লেখাই হোক অন্তঃস্বার শূন্য হলে তার আয়ু দীর্ঘ হবে না। সে বিশ্ব সাহিত্যের সেই পর্যায়ে উন্নত হবে না যেখানে মানুষ চিরকাল ধরে নিজের হৃদয় ধ্বনি শুনতে পারে। কোন বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজের বিকৃতিকে অতিকৃত করে তোলা তার কাজ নয়। মানুষের কাছে সাহিত্যের এই আর একটি প্রত্যাশা যে বিশেষ সময়ের গন্ডী থেকে উত্তীর্ণ করে সাহিত্য তাকে চিরকালের মানুষের সঙ্গে যুক্ত করবে। আমাদের যে সব ভাবনা চিরকালের, ক্ষণকালের আবর্জনার মধ্যে তা ঢাকা পড়ে থাকে তখন সাহিত্যই সেই ঢাকনাকে খুলে সত্যকে পথ দেখাবে। যেমন যখন জাতিভেদের কুপ্রথার জালে মানুষে মানুষে সম্পর্ক তিক্ত বিচ্ছিন্ন ও কুৎসিত তখন কবির সেই মহৎ বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য" আমাদের সেই চিরকালের সত্যকে দেখায় আমরা সমসাময়িক সময়ের বন্ধন মুক্ত হই। কাব্যে যখনই এই মুক্তির আভাস তখনই সে উৎকৃষ্ট। তা না হলে যতই দুঃখীর দুঃখে উদভ্রান্ত বা দারিদ্র্যের জয়গানে মুখর হয়ে ফুটপাতের মানুষের কথা বলার দ্বারা বাস্তবতার গৌরব করুক তা অপকৃষ্ট।

বিশ্ববোধ

বহুদিন থেকে, ধর্মীয়, প্রতিষ্ঠানগুলি, ধর্মচর্চার অঙ্গ রূপে মানুষের দুঃখমোচন অর্থাৎ দারিদ্র্য দূর করা এবং আর্তের ও নিজের পারলৌকিক মঙ্গলার্থে অন্যের ইহলৌকিক মঙ্গল সাধনাকে কর্তব্য মনে করেছে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই কাজ খৃশ্চানেরা দেশে দেশে বিশেষ করে অখৃশ্চান দেশে করে এসেছে। বৌদ্ধদের যখন সুদিন ছিল তখন তারাও ধর্মরাজ্য প্রসারের সংকল্পে প্রধান পন্থা গ্রহণ করেছিলেন দেশে দেশে ঔষধ লতাগুল্ম পাঠান। স্থবির বা থেরা এই নামের বৌদ্ধ শ্রমনেরা মধ্য এশিয়া পার হয়ে ক্রীট্ দ্বীপ পর্যন্ত ঔষধি নিয়ে যেতেন ও রোপণ করে আসতেন। শিখিয়ে আসতেন ঔষধ প্রস্তুত করার প্রণালী, শুনেছি এই থেরা নাম থেকেই নাকি থেরাপিউটিক বা থেরাপি কথাটি এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় মানুষ যতই পরকালের কথা ভাবুক, ইহকালকে এড়িয়ে যেতে পারে না। বৌদ্ধরা অবশ্য ঈশ্বর নিয়ে তত মাথা ঘামান না, কিন্তু খৃশ্চানদের ঈশ্বর জীবন্ত এবং জাগ্রত তাই ঈশ্বরের ভুল ত্রুটিগুলির সংশোধনের ভার অবশ্যই তাঁর ভক্তবৃন্দের উপর কিছুটা বর্তায়। কেন যে তিনি খামকা হঠাৎ একটা লোককে কুষ্ঠরোগে ভোগান, প্লেগ পাঠিয়ে দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেন। কে জানে মঙ্গলময়ের এই অমঙ্গল কীর্তিগুলির ব্যাখ্যা সহজ নয়, সংশোধনও কঠিন। তবে এই কাজে ধার্মিক লোকেরা সর্বদাই চেষ্টিত। মুসলমানদেরও কিছু ত্রাণ কার্য আছে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণভাবে নিজের জাতির লোকের জন্য। কোন মুসলমান অনাথালয়ে আমরা অমুসলমান কোন শিশু পালিত হচ্ছে এরকম দেখবার ভরসা রাখি না।

রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংগঠিত হবার আগে হিন্দুদের কোন সঙ্ঘবদ্ধ ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য মানতে হয় খৃশ্চানেরাই এই কার্যে দড়, এবং বিবেকানন্দ তাঁদের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। জনসেবিকা নিবেদিতা সেই প্রেরণা এদেশে সঞ্চারিত করেছিলেন। আজকে বিশ্বজুড়ে বিশেষ করে পশ্চিম জগতের ধনী সমাজ আর্তত্রাণের পদ্ধতি ও পরিকল্পনার কিছুটা পরিবর্তন করার কথা চিন্তা করছে। শুধু চার্চের হাতে টাকা দিয়েই অনেক মানুষ আর তৃপ্ত হতে পারছেন না। আমরা তৃতীয় দুনিয়ার ও অনুন্নত দেশের অধিবাসীরা হয়ত ভাল করে অনুমানই করতে পারি না পাশ্চাত্য দেশে কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়ে উঠছে। আমাদের একটি সাধারণ মধ্যবিত্তের এক মাসের আয় হয়ত পশ্চিম জার্মানীর একজন ঐরূপ ব্যক্তির একদিনের আয়েরও কম, এবং সেই কারণেই ওইসব দেশের অপব্যয়ও আমাদের চোখে অবিশ্বাস্য। যেসব বস্তু তারা ফেলে দেয়, আমরা তা সারা জীবনে সংগ্রহ করবারও সাধ্য রাখি না। আমেরিকার গাড়ীর আস্তাকুঁড়ে দেখলে সে কথা বোঝা যাবে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রায় সচল 'out of Fashion' গাড়ীগুলি ঝকঝক করে। তার কোন কাঁচ, ষ্টীল বা পার্টস খুলে নেবার আগ্রহ কারো দেখা যায় না। এদেশে ট্রেনের সুইচ্, হোল্ডার জাতীয় কোন কলকব্জা স্বস্থানে থাকতে পারে না, চুরি হয়ে যায়। অভাব এবং স্বভাব এই দুই মিলে এদেশের যে ছন্নছাড়া সর্বনাশা মূর্তি দিনের পর দিন প্রকট হয়ে উঠছে তা আজ সমৃদ্ধ দেশগুলিকে চিন্তিত করে তুলছে। তারা মনে মনে ভাবে এই ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যা তাদের বিপুল ভার নিয়ে হয়ত একদিন পাশ্চাত্য জগতের সুখ সমৃদ্ধির উপর প্রচণ্ড বেগে গলিত লাভার মত গড়িয়ে পড়বে।

এ ছাড়া ভোগবিলাসিতার শীর্ষে ওঠার ফলে অল্পবয়সীদের মধ্যে এসেছে এক ধরনের মানসিক অবসাদ, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নগরবাসী এই সব ছেলেমেয়েরা চূড়ান্ত ঐশ্বর্য, অফুরন্ত স্বাধীনতা সত্ত্বেও কি এক অপ্রাপ্তির দুঃখে উতলা হয়েছে। তারা বলছে চলো চলো এই কংক্রিটের গরাদখানা থেকে বেরিয়ে পড়ি। এইভাবেই হিপি আন্দোলনের শুরু, এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতের গেরুয়াধারীদের ব্যবসায়ের ভিত্তি স্থাপন। কিন্তু এই নিষ্ফলা চেষ্টা যতটা চোখে পড়ছে তাছাড়াও অন্য সফলতার প্রতিক্রিয়ার চিত্র কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। নানা প্রতিষ্ঠান ইউরোপে গড়ে উঠেছে যেখানে ছেলেমেয়েরা গতানুগতিক জীবন থেকে পালিয়ে সার্থকতার জীবন গড়বার চেষ্টা করছে।

ইংলণ্ডে 'অকেণ্ড ভেনাঞ্চার' (Ockendonventure) এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান। এর নেত্রী শ্রীমতী জর্জ পিয়াস—পৃথিবীর সর্বস্থান থেকে আগত রিফিউজিদের আশ্রয় দিচ্ছেন। তিন চারটি প্রাসাদোপম বাড়ি নিয়ে এই আশ্রম। বাড়িগুলি অবশ্য দান হিসাবে লভ্য। আগেকার দিনের বড় বড় জমিদারদের এখন আর সামর্থ্য নেই এইসব প্রাসাদের ভরণ পোষণ করার, তাই ইনকাম ট্যাক্সের কব্জায় পড়ার আগেই সৎ কর্মে দান করে দিয়েছেন। এই বাড়িতে এখন ঘুরছে ভিয়েৎনামের পোলিও গ্রস্থ শিশুর দল। কলকব্জা দিয়ে বাঁধা হাত পা নানা-ধরনের জুতো বেল্ট ইত্যাদি পরে টলমল করে চলতে চলতে তারা বিদেশের জীবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠছে। এসেছে চিলি থেকে, আবিসিনিয়া থেকে ভয়ার্ত পলাতক-

মানুষেরা। এই প্রতিষ্ঠান শিশু যুবক বৃদ্ধ যে কেউ-ই গৃহচ্যুত স্থানচ্যুত তাদের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এক বৎসর আগে এদের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে লন্ডনে পৌঁছেছিলাম। আমাকে এয়ারপোর্টে নিতে এসেছিলেন একটি তিব্বতী ও একটি রুমানিয়ান রিফিউজী। রুমানিয়ান ছেলেটির পিতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পালিয়ে এসেছিলেন। আর তিব্বতীটি কবে ও কখন সস্ত্রীক সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে তা জানি না। যাই হোক এরা এসে বিজাতীয় স্বরে আমার কণ্ঠোচ্চারিত নাম যেভাবে ঘোষণা করেছিলেন তা আমার বোধগম্য না হওয়ায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। আমি লন্ডন শহরের দূর প্রান্তেও চলে গিয়েছিলাম, পরের দিন রুমানিয়ান ছেলেটি আমাকে নিতে হাজির হল। দেখলুম সে এক বিরাট ট্রাক নিয়ে এসেছে, আমি ক্ষীণকায় না হলেও আমার জন্য অত বড় ট্রাকের কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে জানলাম সম্রাট হেইল সেলাসির কিছু আসবাবপত্র এসেছে আবেসিনিয়া থেকে তাঁর পলাতক আত্মীয়-স্বজনের জন্য। সেইগুলি নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে নেবে আমাকেও। বলাবাহুল্য তারা এই প্রতিষ্ঠানের অতিথি কিংবা পি. এল. বা পারমানেন্ট লায়াবিলিটি। যাই হোক হেইল সেলাসির ফার্নিচারের সঙ্গে ভ্রমণ আমার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। প্রায় দেড়শ মাইল গাড়ী চালিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম রাজনীতিবিদরা যে ওয়ান ওয়ার্ল্ড-এর চিন্তা করেন কিংবা যে মারাত্মক সংকীর্ণ জাত্যাভিমানে ভোগেন এসবের হাত এড়িয়ে সাধারণ মানুষের কল্পনায়, জীবনে, অনুভূতিতে মানুষের এক হবার চেষ্টাটা কি প্রবল হয়ে উঠেছে।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় মধ্যরাত্রে চিমনিতে দাহ্যমান কাঠের আগুন ঘিরে সামান্য কিছু খাদ্য নিয়ে আমি কর্মীদের সঙ্গে একত্রে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেখানে দেখা একটি মহিলার কথা ভোলবার নয়। তিনি আমেরিকা থেকে এসেছেন, তাঁর কন্যা কিংবা পুত্র ঠিক মনে নেই, নিজেরা বিবাহ বিচ্ছেদ করে সন্তানটিকে মায়ের কাছে ফেলে সুখভোগের আশায় অন্য কোন নীড়ে চলে গেছে। ছোট্ট নাতিটিকে নিয়ে দিদিমা এই সংস্থায় কাজ করছেন। কয়েকটি কলেজের ছেলেমেয়েকে দেখলাম। কলেজের অর্থাৎ কলেজে ঢুকেই তারা এখানে পালিয়ে এসেছে, ভাবছে এখানে কাজ করলে এমন কোন স্বার্থকতা পাবে যা তাদের গতানুগতিক জীবনে নেই। তাদের বাবা মা বলছেন, তোমরা খাটছো তবে টাকা রোজগার করছো না কেন? বিনা পয়সায় খাটা তো দাসত্ব। কিন্তু স্বেচ্ছায় কোন কাজ করা তো দাসত্ব নয়। টাকার জন্য বাধ্য হয়ে কাজ করাই দাসত্ব। তাই ছেলেরা বলছে তোমরা তো অনেক টাকা করেছো, এমন অনেক কাজ আছে যা ঠিক টাকা দিয়ে মাপা যায় না। এক অল্প বয়সী সুশ্রী ছেলে আমাকে বললে আমার বাবা বলছেন, মিস্ পিয়ার্স তোমাকে দিয়ে দাসত্ব করাচ্ছেন কারণ তিনি তোমার শ্রমের মূল্য দিচ্ছেন না। আমি তাকে বলেছি যদি মূল্য দিতেন, তাহলে এই কাজটা আর আমার কাছে অমূল্য থাকতো না।

গত প্রজন্মে পাশ্চাত্য জগতে এই বোধটা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এখন তার পুনরুদ্ধারের আভাস দেখে খুশী হলাম।

এই একটি সংস্থার কথা এখানে বলা গেল। এরকম আরো বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে

উঠেছে, যারা অনুন্নত দেশের উন্নতির জন্য এবং দুর্দশাগ্রস্ত লোকের কষ্ট উপশমের জন্য কি করা যায় ভাবছে। তাদেরই হাত থেকে ধন মাদার টেরেসার নিরলস হাতে পেঁছাচ্ছে। এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানা রকম কাজ করতে পারছে। এইখানে আমাদের মনে রাখা দরকার যে বাইরের সাহায্য লাভ এবং ক্ষতি দুটোই ঘটাতে পারে। এর লাভের দিক এই যে বিশ্ব মানবের সঙ্গে সংযোগ। মানুষ যে একলা নয় সে কথা বুঝতে পারাই একটা পরম আশ্রয়। আবার সর্বদা ভয় যে এই ভীক্ষাজীবি দেশকে আরো বেশী ভিক্ষা নির্ভর করে তোলা হচ্ছে কিনা। কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানে যখন সুস্থ সবল লোকেদের থালা হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখি, তখন আমার মনে এই প্রশ্ন জাগে। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও আমরা আমাদের জনবলকে ব্যবহার করতে পারলাম না। ভিখারীর সংখ্যা বাড়তেই লাগল। কেউ ছিন্ন বেশে, কেউ ভদ্রবেশে। দুস্থকে দিতেই হবে কিন্তু কাজের বিনিময়ে ছাড়া সে দান তাকে নষ্ট করবে। ডোল দেওয়ায় এদেশে রিফিউজ ঐহিক বা চারিত্রিক উন্নতি হয়নি, এখন এদেশে যুবকরাও বেকারভাতা পাবে ফল কি হবে অনুমেয়।

যাইহোক যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে ভোগ ক্লান্ত মানুষের মধ্যে আজ একটা চেষ্টা দেখা দিয়েছে যে ক্লিষ্ট আর্ত, দুঃখীজনের সঙ্গে সংযোগে নিজেদের সার্থকতার পর পথ খুঁজে নেওয়া। এটা ঠিক আগেকার দিনের দানপুণ্যের লোভের মত নয়. এটা ওপর থেকে উদ্‌বৃত্ত কিছু ফেলে দেওয়াও নয়, এটা সর্বমানবের সঙ্গে সংযোগের একটা চেষ্টা কোনো কোনো মানুষের পক্ষে বলা যেতে পারে বিশ্ববোধের উন্মেষ, কারো কারো পক্ষে হয়ত কেবলই অনুকরণ।

বদ্ধ ও মুক্ত

যাঁরা রাজ্য চালনা করেন, সমস্ত দেশের ভাগ্য যাঁদের হাতে দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের দৃষ্টি সাময়িক অবস্থাকে পার হয়ে দূরে পেঁছাতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের ভোট, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন, নির্দিষ্ট সময় তাদের এসেম্‌ব্লিতে বা পার্লামেণ্টে চীৎকার বা গদিতে উপবেশন, তার পরে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান। অতএব সেইটুকু সময়ের মধ্যে সুবিধামত সুযোগমত যা করা দরকার সেই পথই তাঁরা খোঁজেন। দেশের সমস্যাগুলি খণ্ডিত মূর্তিতে তাদের কাছে দেখা দেয়। যেমন বিরুদ্ধ পক্ষকে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতেই হবে স্থির করে নেওয়ায় স্থির মস্তিষ্কে কোন কাজে সহায়তার কথা তাঁরা চিন্তাও করেন না। তাঁদের সেই নির্দিষ্ট সময়টুকুর মধ্যে সরকারকে উৎখাত করাই কর্তব্য। তারপর তারা যখন সরকার হবেন তখন দেশের হিত করবেন—যতটুকু হিত করলে নিরাপদে নিষ্কণ্টকে আপন সময় সীমায় রাজত্ব ভোগ করা যায়।

এই পরিস্থিতিতে দেশের স্থায়ী কল্যাণের জন্য কোন দূর প্রসারী পরিকল্পনা

রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির কাছে আশা করা যায় না। তাই অনেক সমস্যাই সমাধানের দিকে সরল রেখায় না গিয়ে জটিলতার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। রাজনৈতিকদের হাতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা যে আকার নিয়েছে এটি তাঁদের সীমিত দৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা হতে পারে, এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রসঙ্গ শুধু উল্লেখ করব।

প্রথম যখন ইংরেজ রাজত্ব এদেশে মূল বিস্তার করল নিঃসন্দেহে হিন্দুরা সেটা আকাঙ্ক্ষাই করেছিলেন। হতে পারে অনাচার অবিচারে সাধারণ লোকের অবস্থা এমন হয়েছিল যাতে পরিত্রাণের জন্য তাঁরা ইংরেজ শাসনের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে-ছিলেন। একথা আমি মনে করি না যে ইংরেজ ভারতবর্ষে দুশ' বছর রাজত্ব করে যাওয়ায় এই বহু পুরাতন, বহু,—বিচিত্র ভারবাহী ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হয়েছে —ঐতিহাসিক বিবর্তনের জন্য এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। তবু যুক্তির খাতিরে একথা বলা যায় যে ইংরেজকে সাদরে গদীতে না বসিয়ে তাদের সদ্‌গুণগুলি, তাদের যুক্তিবাদ ও বিচার নীতি গ্রহণ করে নিজেরাই দেশের সুব্যবস্থা করলে যথার্থ দেশ-প্রেমের প্রমাণ দেওয়া হতো।

যাইহোক যে কারণেই হোক হিন্দুরাই ইংরেজ রাজত্বকে নিষ্কণ্টক করতে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন। এরই ফলে তাঁদের মধ্যে ইংরেজদের দেশপ্রেম, যুক্তিবাদ ও উচ্চভাব বাহক দেশ কাল ও জাতির গণ্ডীর ঊর্ধ্বে স্থিত বহু চিন্তা তাঁদের স্পর্শ করে বহু দিনের সংস্কার বন্ধনকে আলগা করে দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে দেশ-প্রেমের জন্ম দিয়েছে। "ছোট ইংরেজ" রাজনীতিবিদ্‌ শাসক ইংরেজ তাতে বাধা দিলেও "বড় ইংরেজ" এই চিত্তের মুক্তি সাধনে সহায়তা করেছে। তার মধ্যে ডিরোজিও বেথুন প্রভৃতি বড় বড় নাম ছাড়াও বহু শিক্ষাবিদ জ্ঞানী-গুণীর নাম ও কীর্তি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। জাতীয় কংগ্রেসেরই প্রথম সভাপতিই ইংরেজ। বস্তুত দেশ-প্রেমের এই উন্মেষের মধ্যে যতক্ষণ ক্ষমতা-দ্বন্দ্ব পৌঁছয়নি ততক্ষণ ধীরে ধীরে একটি বিকাশের দিকে চলেছিল। এই বিকাশ পূর্ণতর হত যদি তার মধ্যে মুসলমানও সমভাবে যোগ দিতেন। তা তাঁরা দিতে পারেননি। কিন্তু কেন পারেননি সে কথাটা জাতীয়তাবাদী স্বাদেশিকতা উদ্বুদ্ধ-হিন্দুর ভেবে দেখা উচিত ছিল। ভেবে দেখা উচিত ছিল সেই দেশ-প্রেমিক মুসলমানদেরও যাঁরা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরাধীনতার ক্লেশ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ভাবতে গেলেই সময় দিতে হয়। রাজনৈতিকদের হাতে সময় কোথায়? অনেক সময় দেবার প্রয়োজন ছিল, যত সময় লেগেছে হরিজন আন্দোলনে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে তত সময় দিতে হত হিন্দু মুসলমান সমাজের বাঁধ ভেঙ্গে দেবার জন্য। চিন্তার বাঁধ, সংস্কারের বাঁধ, অবিশ্বাসের বাঁধ ভেঙ্গে ফেল্লে তবেই প্রকৃত ভারতের রাষ্ট্রমূর্তি আকার নিত। না হয় তার জন্য আর একটু অপেক্ষা করাই যেত। প্রথম দিকে মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেননি। পরে করতে শুরু করেছিলেন। ক্রমে আধুনিক শিক্ষার যুক্তি প্রবাহ হিন্দু মুসলমানকে কুসংস্কারের অনৈক্য থেকে প্রগতির ঐক্যের দিকে নিয়ে যেতই। তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে আজ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে। যে বাংলা ভাষাকে

একদা বাঙালী মুসলমান অবজ্ঞা করেছে সেই ভাষার জন্যই আজ বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুর চেয়েও আগ্রহশীল।

এই জিনিসটা যদি ১৮ বছর আগে হত তাহলে হয়ত ভারত ভাগ হতো না—কিন্তু তার জন্য একটু ধৈর্য প্রয়োজন ছিল যারা প্রথম অগ্রসর হয়েছে পশ্চাৎবর্তীদের এগিয়ে আনতে সাহায্য করা। তা হল না, অধিকার নিয়ে টানাটানি চলল। কিন্তু বিধির বিধানে ফসল ফলাবার জন্য তার নির্দিষ্ট সময়টি দিতেই হবে।

আজ দুই দেশে বিভক্ত হিন্দু-মুসলমান একরাষ্ট্র শাসনেও কেন দ্বিধাগ্রস্ত কেন শত্রুতাপন্ন ? কারণ বিশ্বাস স্থাপনের কোন উদ্যোগই নেই। কোনও উদ্যোগই নেই মিলনের পথটি খুঁজে বের করবার। একদা হিন্দুদের মধ্যে যে যুক্তিবাদের আন্দোলন যে সমাজ সংস্কারের সর্বপণ আগ্রহ, কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রতিবাদ দেখা গিয়েছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের মোহে পরে নেতারা সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। সব দলেরই সমগ্র চেষ্টা গেল হয় নিজেদের গদিতে উঠাবার নয় অন্যকে গদী থেকে নামাবার দিকে এদিকে সাধারণ মানুষ অন্ধকারে ডুবতে লাগল। ফলে আবার নূতন করে আবর্জনা জমতে লাগল। আজকের সার্বজনীন পূজার শ্রদ্ধাহীন মত্ততা সেই কথাই প্রমাণ করে Price of freedom is eternal vigilance—চিত্তের মুক্তি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

এদিকে যেমন হিন্দু সমাজের মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের প্রয়োগ স্তিমিত হয়ে গুরুবাদ ইত্যাদির নানাবিধ ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল—মুসলমান সমাজে আজ পর্যন্ত কোন সামাজিক আন্দোলনই হল না।

বহু শতাব্দী পূর্বের প্রচলিত সম্পূর্ণ ভিন্ন আবেষ্টনে উদ্ভূত সমাজ ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল বিধি বিধানক্লিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ এক বিপুল জনসমষ্টি।

আমার অভিযোগ এই যে হিন্দু সমাজের সমাজ-সংস্কারকরা কোনদিন ভাবলেন না ভারতবাসী হিসাবে এদিকে তাদের কর্তব্য কিছু আছে। অবশ্য এর সোজা উত্তর এই আজো যা শুনছি তা হচ্ছে মুসলমান সমাজের কোন অগ্রগতির জন্য হিন্দুর বলবার অধিকার থাকতে পারে না। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে একথা আজো তথাকথিত প্রগতিশীলবাদী হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে শোনা যাচ্ছে। এমন কি কোন কোন কমিউনিষ্টও বলেন। তাঁদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে হিন্দুর কল্যাণ ও মুসলমানদের কল্যাণ এই দুরকম কল্যাণ আছে না কি ? হিন্দুর লজিক ও মুসলমানের লজিক দুটো হবে কি ? না কার্ল মার্কস শুধু জার্মান জাতির ভাল করতে জন্মেছিলেন ?

একটি দেশের সরকার যা এক সম্প্রদায়ের পক্ষে উচিত এবং কল্যাণকর মনে করে, অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে তা অকল্যাণকর মনে করতে পারে না। তবে প্রতিরোধের ভয়ে আপোষ করতে প্যারে এই মাত্র।

পৃথিবীতে যত ধর্ম প্রবক্তা জন্মেছেন তাঁরা বিদ্রোহী। পুরানো ব্যবস্থা নানারকম অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালে ভরে গেছে তখন তাঁরা নির্মমভাবে তা ঝেড়ে ফেলেছেন। তাঁদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে হলে কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে

দেখতে হবে, তাঁরা কতগুলো অন্ধ বিশ্বাস পালন না করে কেন নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন এবং এযুগে এখন তারা উপস্থিত থাকলে কি করতেন। যাঁরা মুক্ত তাঁরা কখনো মানুষের জন্য চির বন্ধনের নির্দেশ দিয়ে যাননি, সে রকম কল্পনা করলে তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস করা হয় এবং মানুষের মর্যাদা নষ্ট করা হয়।

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে দুটো দিক আছে, একটা চিরন্তনী আর একটা সাময়িক—চিরন্তন দিকটি মোটামুটি সব ধর্মেই একইভাবে প্রকাশিত। সেইটি মানব-ঐক্যের একটি প্রবহমান অমৃতবাহী ধারা। আর সাময়িক দিকটি স্থানে কালে সমাজে সমাজে বিচ্ছিন্ন—অতএব প্রয়োজন অনুসারে তার পরিবর্তন না করলে অনড় অবস্থা উপস্থিত হয়ে সমস্ত উন্নতির বাধা স্বরূপ হয়ে ওঠে। তাই বার বার সেই সক্রিয় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়—এই চেষ্টার গতি প্রকৃতির ওপরই বিশ্ব মানবের ভাগ্য নির্ভর করে—ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কেউ এগিয়ে কেউ পিছিয়ে এই গতির অংশ তাকে নিতেই হবে কারণ এটা নিশ্চিত যে মানুষ ক্রমাগতই অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোতে যাবে, এই যাওয়ার চেষ্টাতেই তার বাঁচার আনন্দ।

সুন্দর ও অসুন্দর

সব পেয়েছির আসরের ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সারা বৈশাখ মাস জুড়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব করছ, এ উৎসব জাতীয় পার্বণের মত ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে। তোমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ আজ ঐতিহাসিক পুরুষ, কিন্তু এই কিছুদিন আগেও তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, হাস্যে-পরিহাসে-কৌতুকে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে, সকলের বন্ধু হয়ে, আবার সমস্ত দেশের পথ-প্রদর্শক হয়ে। যাঁরা তাঁকে চোখে দেখবার, তাঁর কাছে যাবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁরা' আজও অনেকে বেঁচে আছেন, তাঁদের কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা শুনতে তাই এ যুগের মানুষের কৌতূহল—অনেকেই তাই এ বিষয়ে লিখেছেন, যার যেমন মনে আছে, যে যতটুকু দেখেছিলেন এ যুগের মানুষের কাছে গল্প বলে চলেছেন। তাঁর জীবনের শেষ পনের বছর তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল সে কথা নানা জায়গায় লিখেছি—বলা বাহুল্য যখন তাঁর বয়স 'সব পেয়েছির আসরের' সভ্যদের মত তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবার সুযোগ হয়নি। কাজেই তোমাদের মত বয়সে তিনি কেমন ছিলেন তার খবর তোমাদেরই মত বই থেকে পড়েই আমারও জানা, অবশ্য কিছু কিছু তাঁর মুখ থেকেও শোনা। নিজের কৈশোরের একটি ছবি 'ছড়া ও ছবি'তে 'বালক' বলে কবিতাটিতে তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে এত বড় কবি হয়েছিলেন তার একটা সম্ভাবনার আভাস ভেসে আসে ঐ কবিতাটির মধ্যে। বাহিরের জগতের নানা রকম ঘটনার মধ্যে তাঁর বালক মনের একটি আলাদা জগৎ

"সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা—"সেই জগতের সবটা জুড়ে বিশ্বসৌন্দর্যের যে খেলা চলছে তাতে তাঁর মন চারপাশের সাধারণ ছেলেদের চেয়ে কত যে পৃথক হয়ে গেছে জীবন-স্মৃতি গ্রন্থেও তার আভাস পাওয়া যায়। এক গভীর সৌন্দর্যবোধ তাঁর সমস্ত আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করত, কোনওরকম কুরুচিপূর্ণ কথা বা অভব্যতা আদপেই সহ্য হত না। অল্পবয়সী ছেলেরাও অনেক সময় যে সব ভাষা ব্যবহার করে, অসভ্যতা করে তা তাঁর সুকুমার রুচির উপর কর্কশ আঘাত করত—প্রায় সেই কারণেই স্কুল, কলেজ তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। শুধু ছাত্ররা নয়, অনেক সময় মাষ্টার মহাশয়রা পর্যন্ত কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিতেন। একজন পণ্ডিতমশায়ের এই রকম আচরণে কবির এতদূর ঘৃণা জন্মাত যে, জানা পড়াও তিনি উত্তর দিতেন না। অবশ্য এই নন্‌কোঅপারেশনের ফল যে খুব ভাল হত না তা বুঝতেই পারছ, গালাগালির মাত্রাটা বেড়েই যেত। স্কুল, কলেজে অনেক সময় দল ছাড়া নূতন কোনো ছেলেমেয়ে এসে পড়লে তাকে ক্ষেপানর মাত্রাটা অনেক সময় নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পেঁছিয় সেটা যে তাঁর কত খারাপ লাগত তা গল্পগুচ্ছের দু'একটি গল্পে বিশেষ 'গিন্নী' গল্পটিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের কথা যাঁরা জানেন তাঁরা একটি কথা ভুলতে পারবেন না। সে তাঁর সুচারু সৌজন্যবোধ—। সৌজন্যবোধ সৌন্দর্যবোধেরই একটি অঙ্গ—মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কোনো অশালীনতা কর্কশতা রূঢ় বা অশোভন আচরণ তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল —।

আমরা মহৎ মানুষদের পূজা করি, তাদের ছবি টাঙিয়ে মালা পরাই কিন্তু আমাদের মধ্যে তাঁদের জন্মকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করি না। যদি করতাম আজকের বাংলাদেশে এত রবীন্দ্রোৎসব হওয়া সত্ত্বেও পথে-ঘাটে এত অশোভনতা, এত অভদ্রতা ঘটতে পারত না। একটা কথা মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ যখনই পথে বেরুতেন অতি মৃদুস্বরে পার্শ্ববতীর সঙ্গে কথা বলতেন, যাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন সে ছাড়া অন্য কেউ শুনতে পেত না—এটা যে একটা সদাচার তা ক'জন জানে বল? জানলে কি বয়স্ক লোকেরাও ট্রামে-বাসে উচ্চৈঃস্বরে যে রকম নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে চলেন তা হতে পারত? যেখানে আর পাঁচজন উপস্থিত আছেন যাঁরা তোমাদের চেনেন না বা তোমাদের গল্প কথায় কৌতূহল অনুভব করেন না বা যোগ দিতে পারেন না। তাঁদের সামনে চেঁচামেঁচি করে নিজেদের গল্প করা যে অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করা ও সেজন্য অভদ্রতারই নামান্তর একথা কেই-বা লক্ষ্য করে? জীবনের প্রত্যেক ভঙ্গীতে চলাফেরা কথাবার্তা আলাপ অভিবাদন সর্বত্রই যে সৌন্দর্যের স্থান আছে তা জানলে সভায় বসে পান চিবোন ও দরকার পড়লে ফিক্ করে পানের পিক্ ফেলা দাঁত খোঁচান যা আমাদের মধ্যে শিক্ষিত বয়স্ক লোকেরাও করে থাকেন তা কি করতে পারতেন? জীবনের প্রত্যেক আচরণে সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে উঠলে এই মানুষের মরদেহ যে কী অনির্বচনীয় রূপ নিতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মূর্তিখানি না দেখলে ধারণাই করা যেত না। ছোট বড় কত কুশ্রীতায় ভরে থাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন, গালাগালি, চেঁচামেঁচি, এমন কি চলাফেরা, অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্যেও অসুন্দরের প্রকোপ আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যায়। এগুলি যে মনুষ্যত্বের মর্যাদার হানিকর সে কথাই বা কার লক্ষ্য হয়? কিন্তু

শত সহস্র রকম কাজের মধ্যে নিরন্তর ব্যস্ত থেকেও নানারকম সাংসারিক, পারিবারিক ও জগতের সমস্যায় পিষ্ট হয়েও ধৈর্যচ্যুতি বা রুক্ষ পুরুষতা তাঁকে স্পর্শ করত না। জগতের মালিন্যের অনেক উপর দিয়ে ভেসে চলা। সেই জীবনখানি ঈশ্বর মানুষকে যা হতে বলেছেন তাঁর সেই আশা পূর্ণ করেছিল।

তাঁর কবিতা আমরা পড়ি, আনন্দ পাই, কোনো কোনো সময় আত্মহারা হয়ে যাই। কিন্তু কবিতা আমাদের সুন্দরের জগতে ক্ষণকালের জন্য ডেকে নেয়, আবার আমরা ফিরে আসি মলিন কুশ্রীতার মধ্যে, নৈলে যে দেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন সে দেশে রাস্তার ওপরে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে শত শত লোক মিলে একটি লোককে পিটিয়ে মারতে বা লিঞ্চিং করতে পারে কি করে? হয়তো সে চোর, নয়ত চোর সে নয় কিংবা হয়ত কাউকে গাড়ীতে ধাক্কা দিয়েছে, হয়ত সে চাপা পড়েছে, দোষটা তারই কিন্তু অত কে বিচার করে, খুনের আনন্দ আমাদের চেপে বসে, আমরা স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই দেখার আনন্দ নিয়ে দূরে থেকে তাকিয়ে দেখি। পথে-ঘাটে, সভায় কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র অসুন্দরের তাণ্ডব নৃত্য যদি চলতে থাকে তার মধ্যে এই রবীন্দ্র বন্দনা আমাদের প্রকৃত পক্ষে কোনো কাজেই লাগে না। তিনি এসেছিলেন বলেই, আমাদের জীবনে আরও সুন্দর, আমাদের কর্তব্য আরও সুস্থির, আমাদের ধর্ম আরও অবিচলিত, মিথ্যা আরও প্রতিহত যদি না হয় তবে কি হবে পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে?

নারীমুক্তি

বিশ্বনারী বর্ষে মেয়েরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী। একথা ঠিকই যে মেয়েরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায় নি। এই সেদিন পর্যন্ত সুইজ্যারল্যাণ্ডে মেয়েরা ভোটের অধিকার পায় নি। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে সামগ্রিক ভাবে মেয়েরা আজ আর জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। যে সব দেশে বা জীবনের যে সব ক্ষেত্রে তারা আজও পুরুষের সমান অধিকার পায় নি—যেমন ভোটাধিকার বা সমান মজুরী, উত্তরাধিকারের প্রশ্ন—সেই সব বিষয়ে খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম অবশ্যই চলছে ও চলা প্রয়োজন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আজ নারীমুক্তি আন্দোলন বলতে ঠিক কি বোঝায় আমি তা বুঝতে পারি না।

কোনো কোনো দেশে দেখেছি এদের উগ্রতা। তারা তো বিবাহই উঠিয়ে দিয়েছে। বিবাহ মানেই বশ্যতা। একটি বুদ্ধিমতী স্বাধীনচেতা মেয়ের সঙ্গে লণ্ডনে কথা হচ্ছিল। সে বিবাহ করে নি কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে বসবাস করছে—তার বক্তব্য যে-কোনো রেজেষ্ট্রী পাতায় নাম লিখিয়ে এলেই কি চরম উন্নতি হল? যদি আমাদের দুজনের মধ্যে একজন বিরূপ হয় তবে আর একজন আত্ম সম্মান বিসর্জন দিয়ে তার সঙ্গে থাকতে চাইবে কেন? অর্থাৎ Ted যদি Maryকে না চায় Mary তার সঙ্গে থাকবে কেন? কেউ তো কারু উপর আর্থিক কারণে নির্ভরশীল নয়। যখন সন্তানের প্রশ্ন তুললাম তখন তার বক্তব্য সন্তানরাই বা কেন শিখবে না বাপ

মাকে স্বাধীনতা দিতে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম তোমার এই দর্প চূর্ণ করবার জন্য দর্পহারী তো মুগুর হাতে বসেই আছেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়স হবে যখন দাঁত পড়বে, চর্ম হবে লোল তখন কোনো মেয়ে আর নূতন বন্ধু পাবে না কিন্তু পুরুষ প্রায় আজীবন সুন্দরী নারী সংগ্রহ করতে পারবে।

আমেরিকাতে দেখেছি বহু মেয়ের ধারণা জন্মেছে যে এতকাল মেয়েরা ঘর-সংসারের কাজ করত, ছেলে দেখত, আর পুরুষ যেত রোজগার করতে -যে অর্থ আনে সেই তো প্রভু। কাজেই আজকাল পুরুষ থাক ঘরে আমরা রোজগার করতে যাই। মা যদি সন্তান পালন করতে পারে বাপই বা কাঁথা ধোবে না কেন! কথাটা, অর্থাৎ এই যুক্তিটা, বেশ হাস্যকর শোনাতে পারে তবে, এ ব্যবহার হচ্ছে এবং পুরুষরাই সুযোগ নিচ্ছে। অনেক ছাত্র বান্ধবীর অন্নে বা পাঁউরুটিতে মানুষ বা অমানুষ হয়ে পাঠ্যদশা শেষ হলে আপন পথে চলে যায়—। স্বচক্ষে একটি বিবাহিত পরিবার দেখলাম যেখানে পুরুষটি কিছুই করে না শুধু ঘর-সংসার দেখে—স্ত্রী চাকরী করে—মেয়েটির সন্তান সম্ভাবনা ছিল শুনলাম ছেলে হলে ওর বাপই তাকে দেখবে সেজন্য বোতল ভর্তি করা প্র্যাকটিস করছে।

মেয়েদের স্বাধীনতার দাবী পাশ্চাত্য দেশে প্রায় পোলেটিক্যাল চরিত্র পেয়েছে। প্লাকার্ড নিয়ে প্রসেশন দেখলে আমাদের তো হাসি পায়। এ যেন গায়ে পড়ে একটা ঝগড়া সৃষ্টি করা। ওদের গাল ফুলিয়ে চীৎকার দেখে আমার মনে হত আগে যেমন পাড়া কুঁদুলীরা গাছ কোমর বেঁধে ঝাঁটা হস্তে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গাল পাড়ত এ যেন তারই নতুন সংস্করণ। সমস্ত পুরুষ জাতি যেন নারী জাতির শত্রু একি হতে পারে? পুরুষ আর নারী কি দুটি শ্রেণী? পুরুষ আর নারী একটি বৃত্তের দুটি অংশ। দুটি মিললে তবেই পূর্ণতা। দুটি অংশই যাতে সমান পুষ্টি, সমান জীবন পায় সেটাই প্রার্থনীয় ও সাধনীয়—সমাজকে দ্বন্দ্ব মুখর করে তোলা নয়।

আমাদের দেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন পুরুষরা। মেয়েরা নয়, তখন অজ্ঞ মেয়েরাই সে অগ্রগতিতে বাধা দিয়েছে। পুরুষ যে নারীর অধিকারের জন্য চেষ্টা করেছে সেটা একটা দাক্ষিণ্য নয়—সংস্কার মুক্তির আন্দোলনের সেটা ছিল একটা অঙ্গ। কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে যেমন সকল মানুষের সমান সুযোগের জন্য চেষ্টা হয়েছে, শ্রমিকের চাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে, সেই সঙ্গে মেয়েদেরও স্বপ্রতিষ্ঠ হবার পথের বাধাগুলো মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে সেটা একটা সামগ্রিক প্রচেষ্টারই অন্তর্গত। আজকের দিনে আমার তো মনে হয় না মেয়েদের স্বাধীন হবার জন্য কোনো উৎকট যুদ্ধ দরকার।

বস্তুত স্বাধীনতার নানা রূপ আছে আমরা যদি কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পরিবারের বন্ধন মুক্ত স্বেচ্ছাসম্পর্ক স্থাপনের স্বাধীনতা, সন্তান ধারণ ও পালন না করার স্বাধীনতার জন্য আগ্রহী হই (যা অহরহ পশ্চিমে শুনতে পাচ্ছি—এবং যা পশ্চিমে শুনছি তা কিছু পরেই পূর্বেও শুনতে পাব. এ যুগে তো সূর্য পশ্চিমেই উদিত হচ্ছে!) তা হলে সে একটা খেয়াল বা হুজুগ মাত্র অচিরেই সে ঝোঁক কেটে যাবে—কেবল রেখে যাবে কতকগুলো শুকনো চিন্তার ছিবড়ে।

কোনো আইন, কোনো নিয়ম কখনো স্থায়ী বা ফলপ্রসূ হয় না যদি তা প্রকৃতির

বিরুদ্ধাচারী হয়। মানুষের স্বভাবের মধ্যে কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা ভাব আছে যা ঠিক যুক্তি দিয়ে তৈরী নয়, যা তার সামাজিক জীব চরিত্রের স্থূল ভিত্তি—এক তার বিবেক, অন্যটি বিচার বুদ্ধি। মানুষ জানে যে সুবিচারে তার ন্যায়-সঙ্গত দাবী আছে। যদি সে দাবী খণ্ডিত হয় তবে তা নিন্দার্হ। সমাজে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী এই সুবিচার লাভে বঞ্চিত হয় সামাজিক পরিস্থিতিতে শোষক ও শোষিতের পালা বদলায় ভঙ্গী বদলায়। তবু তার মধ্যে প্রতিকূল পরিবেশেও কোনো কোনো বিশেষ মানুষের মধ্যে মনের ধর্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখা দেয় তখন সে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে অবিচারের পাথর টলিয়ে দেয়—এদেশে মেয়েদের উপর থেকে সেই কঠিন পাথরটি সরালেন বিদ্যাসাগর। অনেক যুদ্ধ তাঁকে করতে হয়েছে সেটা স্বার্থ যুদ্ধ নয়, পরার্থ যুদ্ধ।

আজকে মেয়েরা যে আন্দোলন করবেন সেটা শুধু মেয়েদের সুযোগ-সুবিধার জন্য হলে হবে স্বার্থ যুদ্ধ। যদি তা সমগ্র মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য হয় তবেই তা হবে সত্যকারের মুক্তি। মুক্তি একটি খণ্ডিত বস্তু নয়, তা পূর্ণতারই অভিব্যক্তি।

বর্তমানে ভারতে মেয়েদের আইনসঙ্গত অধিকারের সীমা অনেক বিস্তৃত হয়েছে। বিষয়-সম্পত্তির ভাগ সে সমভাবেই পাবে। পুরুষের বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ, (অবশ্য মুসলমানদের নয়) বিবাহ-বিচ্ছেদও উভয়পক্ষের কাছেই অনায়াস লব্ধ কিন্তু তবু কি চিত্তের স্বাধীনতা পূর্ণ হয়েছে ? হয়নি—। সম্প্রতি একটি বিতর্ক পড়ছিলাম কোনো নবীনা লেখিকা হা-হুতাশ করছেন যে তিনি এদেশে মন খুলে লিখতে পারেন না কারণ লিখতে গেলেই তাঁর শ্বশুর ভাসুরের মুখচ্ছবি মনে ভেসে ওঠে। শ্বাশুড়ীর ওঠে কিনা জানি না। যা হোক আজকাল যে সব মেয়েরা শ্বশুর ভাসুর কে তুড়ি মেরে চলতে যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়েছেন, যাদের আচরণে শালীনতার অভাবই স্বাধীনতার প্রতীক, তাদের হঠাৎ লিখতে গেলে শ্বশুর ভাসুরের মুখ মনে পড়বে এটা বিশ্বাস্য নয়। এটা শুধু একটা মেয়েলীপনার ভঙ্গী—আসল কথা বাধা হচ্ছে নিজের অন্তরে। অন্তরে সত্যকে চিনতে শেখা,জানতে শেখাও তদনুযায়ী চরিত্র বল দেখাতে পারাই স্বাধীনতা। লিখতে বসে লেখিকার সত্ত্বা যদি তাঁর চিন্তার সত্যে বল না পান তাঁর কেবল মনে হতে থাকে এতে কে, কোথায়, কি ভাবে, তাঁর কতটা সুনাম, কতটা দুর্নাম হবে তাহলে অবশ্যই তিনি আধুনিক সাজে সজ্জিতা হলেও মানসিক মুক্তি লাভ করেন নি। যখন নারী মুক্তি আন্দোলনের চিন্তা সুদূর ছিল, যখন সমাজের সব চেয়ে কঠিন নিপীড়ন ছিল জায়া জননী ও কন্যার উপর তখনও কিন্তু সমাজের শাসন উপেক্ষা করে কোনো কোনো নারী চরিত্র চিত্তকে স্বাধীনতার উদ্দীপ্ত হতে দেখা গেছে। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি নায়িকাই এই মনোবল দেখাতে পেরেছেন। মেজদিদির, দিদি-স্বামীকে অগ্রাহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিজস্ব অবিচল আস্থা দেখাতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের 'দিদি'ও এমনি একটি চরিত্র স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নাবালক ভাইয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সাহস সে দেখিয়েছে তা সত্যই একটি মুক্ত মনের লক্ষণ এগুলো গল্পের চরিত্র হলেও অস্বাভাবিক নয়—ঘরে ঘরে এরকম নারীর শক্তি ও দীপ্তি দেখা গেছে। এরা সেই চিরকালিনী নারী যাদের কল্পনা

করেছেন কবি। আজ তাই খুব আশ্চর্য লাগে যখন সর্ব প্রকারে শিক্ষিতা আধুনিকারাও বলেন যে লিখতে বসে তাঁরা ভয়ে ভয়ে লেখেন 'পাছে লোকে কিছু বলে' কিন্তু সত্য অনুভূতিকে রূপ দেবার কথা ভাবতে পারেন না তখন কবির সেই উক্তি মনে পড়ে—'দেখি আমায় বন্দী করে আমারই এই ডোর।' শিকল নড়ার কারখানাটা মনের মধ্যেই বাহ্যিক মুক্তি যতই হোক সেই মনের কারখানাটা সামলাবে কে ?

আসল কথা স্ত্রী যদি পুরুষের ভূমিকা নেয় তবেই সে মুক্ত হল তাও যেমন সত্য নয় এবং পূর্ণ নারী সত্তা বজায় রেখেও চিত্তের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব।

আজ বিশ্বনারীবর্ষে মেয়েদের সাধনা হোক পূর্ণ মনুষ্যত্বের—কোনটা সত্য কোনটা অসত্য কোনটা মঙ্গলকর কোনটা নয়—এবং কোনটাতে সমগ্র মানব সমাজের অগ্রগতি সেটাই হোক বিচার্য যে সাধনা পুরুষেরও। নারীও সমগ্র মানব সমাজেরই অঙ্গ—পুরুষের সঙ্গে লড়াই তার হতেই পারে না কারণ বিশ্ব মূর্তি অর্ধনারীশ্বর।

অনুবাদ সাহিত্য ও রবীন্দ্রকাব্যের অনুবাদ

সম্প্রতি যখন শব্দের গতিতে যানবাহন চলেছে দেশ-দেশান্তরে তখন মনের গতিও পথ খোঁজে দেশ-দেশান্তরের মনে। দেশ-বিদেশে গিয়েই বা কি হবে, দেশবিদেশের লোককে ডেকে এনেই বা কি হবে—যদি আমার ও তার মনের কথা বুঝতে বা বোঝাতে না পারি ? বর্তমানে তাই দুটি দিকে মানুষের ঝোঁক পড়েছে—এক নানা ভাষা শেখা আর এক অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টি করা। একজন সাধারণ শিক্ষিত লোক যাকে আর পাঁচটা কাজ করে অর্থ উপার্জন করে সংসার চালাতে হয় তার পক্ষে খুব চেষ্টা করলেও মাতৃভাষার সঙ্গে আর একটি বা দুটি ভাষার বেশী আয়ত্ত করে ওঠা সম্ভব হয় না। যদিও সামান্য একটু শিখেই অন্যান্য ভাষার কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে স্বদেশের কাব্য সাহিত্যের তুলনামূলক রচনা আধুনিক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে—র‍্যাঁবো আর রিলকের সঙ্গে রবীন্দ্র কাব্যের তুলনা করে, রবীন্দ্র সাহিত্যকে অনেকাংশে নিকৃষ্ট প্রমাণ করে, নানা উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ উচ্চশ্রেণীর পত্রিকায় শোভাবর্ধন করছে। বস্তুত তা পত্রিকার শোভা বর্ধন ছাড়া পাঠক সাধারণের মনে আর কোনো প্রভাব ফেলতে পারছে কিনা সন্দেহ। যে কাব্যের অগ্র পশ্চাৎ, আসমান জমীন, পট-ভূমি বা পরিপ্রেক্ষিত জানা নেই—পাঠকের কাছে সেই অজ্ঞাত জগতের খবর শুধু মন্তব্যের দ্বারা উদ্ভাস করার সাধ থাকলেও সাধ্য কম লেখকেরই আছে। সেজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী কাব্যের তত্ত্ব-বিশ্লেষণী সমালোচনা এক প্রকার নিষ্ফল। আজ পর্যন্ত গ্যেটের কাব্য সম্বন্ধে বহু চুলচেরা বিচার শুনেছি গ্যেটের জীবন সম্বন্ধে বহু গুপ্ত বা প্রকাশ্য তথ্যও জানা গেছে, জার্মান ভাষা না জানার সামান্য কারণবশতঃ সেদিকে কোনই বাধা হয় নি, কিন্তু ঐ সামান্য কারণে তাঁর কাব্য পড়বার কোন সুযোগই ঘটতে পারে নি। এর হেতু এই যে আমরা যখন বিদেশী

সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে যাই তখন সাহিত্য রসাস্বাদনের চেয়ে বিদ্যা জাহির ও গুজবের স্পৃহা বলবতী হয়ে ওঠে। বর্তমানে অনেক নবীন সাহিত্যিক যে সব বিদেশী লেখকের গুণগ্রাহী হয়ে কথায় কথায় তাদের রচনার গুণ গরিমার উল্লেখ করেন তারা কেউই নিজ নিজ প্রিয় কাব্যের অনুবাদের চেষ্টা করেন না। কাব্যের অনুবাদ ঠিকমত করা ও তার রস অবিকৃত রাখা সহজ নয় সে কথা জানি—কিন্তু অনুবাদ ছাড়া আর কি করেই বা জানব বিশ্ব সাথে যোগে "কোথায়" বিহারো 'কোনখানে' যোগ তোমার সাথে আমারো ? বিদেশী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ রসাস্বাদনের জন্য অনুবাদ ভিন্ন পথ নেই। দৈব দুর্বিপাকে এবং অদৃষ্টের ফেরে ইংরেজি ভাষা এ দেশে সমাজের একটা পর্যায়ে চালু হয়েছে এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই ঐ সাহিত্যের রসাস্বাদন কিছু লোকের পক্ষে সম্ভব হয়েছে—ইংরেজি থেকে বহু গ্রন্থও তাই দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে আসছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে। ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গেও আমাদের যা কিছু পরিচয় তাও ইংরেজি অনুবাদের ফলে—বিশ্ব-সাহিত্যের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় একবার ঘুরপাক খেয়ে আমাদের হাতে পৌঁছেছে। একে ত অনুবাদের কাজ সহজ নয় দ্বিতীয়তঃ তার সেকেন্ড হ্যান্ডের দাম আরো কিছু কম। তবু মূল থেকে অনুবাদের দিকে এখনও খুব বেশী চেষ্টা দেখা যায় নি। যদিও ভারতীয় মন যেমন বিদেশের প্রতি উন্মুখ এমন বোধহয় আর কোথাও নয়। যেসব ভাব, ভঙ্গী, প্রেরণা, সমাজ বিন্যাস, আচার-আচরণ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা নেই যা শ্রদ্ধাও নেই তবু সাহিত্যের পথে সে সব অবস্থার রস গ্রহণে আমাদের বিমুখতা নেই। যখন আমাদের একান্নবর্তী পরিবার বদ্ধ জীবনে স্ত্রী পুরুষ স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ মিলনে মিলিত হতে পারত না, তখন পুরুষের কথা যাই হোক মেয়েদের একনিষ্ঠা, স্বার্থশূন্যতা ও ভোগ বিলাসে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য অত্যন্ত প্রগতিশীলরাও সতী নারীর লক্ষণ বলে জানতেন। শরৎচন্দ্রের সব রকম ট্যাবু বিহীনা নায়িকা শেষ প্রশ্নের কমলকেও তাই একাহারী হয়ে আহারের সংযমের দ্বারা পাঠকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে হয়েছিল। পতিতাকে সাহিত্যে স্থান দিতে গিয়ে শুধুমাত্র তার মানবিক গুণেই, স্নেহ মমতার সিংহদ্বার দিয়ে পাঠকের মনে প্রবেশ করাতে সাহস পাননি—আচার বিচারের সংযম পুরুষের প্রতি সুকোমল সদা জাগ্রত সেবা এমন কি কঠোর উপবাসের অগ্নিশুদ্ধি না করিয়ে শরৎচন্দ্রের মত প্রথা বিরোধী, যুক্তিবাদী মনও উপন্যাসের সমাজেও দ্বার খুলতে পারেন নি। সমাজ মনের এইরকম অবস্থাতেও কিন্তু আমরা মোঁপাসার গল্প গুলিতে রস পেয়েছি। ডস্টোভেস্কির ক্রূর বঙ্কিম চরিত্রগুলিও বুঝতে পেরেছি। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নেই—আমাদের পারিপার্শ্বিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মানব সমাজে নানা অবস্থার তির্যক ভঙ্গীতে মানব মনের সাত রঙ্গা রশ্মি তার সবগুলি আলোই আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। শুধু কেবল অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা নয় বিচিত্র অবস্থায়, বিচিত্র রসানুভূতিতে আর্দ্র মানব মনের বৈচিত্র্য আমাদের কল্পনাকে দ্রব করতে পেরেছে। শ্রেয় বুদ্ধিতে যাকে অমার্জনীয় ও অকল্যাণকর বলে জানি এমনও কত ক্রূর কুটীল কামনা, পঙ্কিল ঘটনা সাহিত্যের পথে মানব সত্য রূপে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। শিল্পের উৎকর্ষ দিয়ে যার কোন প্রতিরূপ সমাজে বা জীবনে বাঞ্ছনীয় নয় এমনও

কতো ঘটনা শুধু সাহিত্যরূপে, শিল্পরূপে, মনের কাছে আবেদন এনেছে চিরকাল। অজ্ঞাত সমাজের রীতি ও রুচির আকৃতি বা বিকৃতি কোনটাই আমাদের মনকে বিমুখ করতে পারে নি, যেখানে সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠে সেখানেই আমাদের অনুভবকে স্পর্শ করতে পারে। তাই সমগ্র ইযোরোপীয় সাহিত্য ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রাণের পূর্ণ সম্ভার নিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ছাড়পত্র পেয়েছে।

ইংরেজি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকেই ভারতীয় ভাষায় বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু হয়েছে কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য আজ পর্যন্ত বিশ্বের দরবারে পৌঁছাবার পথ পেল না। ম্যাক্সমুলারের ঋকবেদের অনুবাদ ঐতিহাসিক ভারতের অন্তর্জগতের খবর দিয়ে প্রথম যে বিস্ময় জাগিয়ে ছিল তারই ফলে ক্রমে ক্রমে শাস্ত্র গ্রন্থগুলির কিছু অনুবাদ হয়েছে। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা দর্শন ও তত্ত্বের অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যের অতি সামান্য একটি অংশ ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য আজও কিছুই অনূদিত হতে পারছে না। প্রকাশকদের ঔদাসীন্যই এ পথের সবচেয়ে বড় বাধা। প্রকাশক বাজার ও চাহিদার কথা চিন্তা করেন, লেখক চিন্তা করেন তাঁর আপন অন্তজগতের প্রকাশের রূপ—প্রকাশক বলেন, বিশেষত ইংরেজ প্রকাশকরা মনে করেন তাঁদের দেশে লোকে কেমন ভাবে ভাবে, তাঁদের জনসাধারণ কী চায়, কোন বই কোন ভাবে লিখলে তার কাটতি বেশী হওয়া সম্ভব—সেই ছকে না মেলাতে পারলে তাঁরা গ্রন্থ প্রকাশ করবেন না--অথচ ভারতীয় প্রকাশক কমই আছেন যাঁরা ইংরেজিতে অনূদিত বই-এর বিদেশে প্রচার করবার সামর্থ্য রাখেন। বিদেশী প্রকাশকদের একথা বোঝান যায় না যে তোমাদের পাঠকের মনের ভঙ্গী ও গতি যে অভিমুখী সেই অনুসারে কাব্য লিখে দিলে তা অভিনব একটা কিছু ইংরাজি রচনা হতে পারে কিন্তু তা আমাদের সাহিত্যের অনুবাদ হয় না—এবং তার দ্বারা আমাদের মনের গতিভঙ্গী ও প্রবণতা বোঝান হয় না। এ কথার সোজা উত্তর এই তোমাদের কথা কেই বা জানতে চাইছে। এই কারণেই সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের আজ পর্যন্ত সামান্যই অনুবাদ হয়েছে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সাহিত্য অনুবাদের দিকে রাশিয়া ও তার অনুবর্তী দেশগুলির মধ্যে একটা বিশেষ চেষ্টা দেখা দিয়েছে। যে সব বই ইতিপূর্বে ইংরেজি থেকে অনুবাদ হয়েছিল সেগুলি তারা সোজাসুজি বাংলা থেকে অনুবাদ করেছেন। আট ভল্যুমের একটি সংগ্রহ ছাপা হচ্ছে। তাঁরা অন্যান্য ভারতীয় লেখকদের গ্রন্থও কিছু কিছু অনুবাদ করেছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু সংশ্লিষ্ট থাকায় আমি জানি যে এই অনুবাদ তাঁরা বেশীর ভাগই বাঙালীর সাহায্য ছাড়াই করেছেন। কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে তাঁরা যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন তা উপযুক্ত বলা যায় না। যাঁরা বাংলা ভাষা শিখেছেন তাঁরা কবিতার অক্ষরার্থ নিরূপণ করে অনুবাদটি করেছেন, তারপর রুশ কবিদের কাছে সেটি পেশ করা হয়েছে, তাঁরা বাঙ্গলা জানেন না কিন্তু অক্ষরানুবাদটিকে তাঁরা মিলের ছন্দে বন্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য বিদেশী কবিতার ছন্দ বন্ধ অনুবাদের উপর আস্থা রাখা কঠিন। যাঁর উপরে এইসব অনুবাদের ব্যবস্থাপনার ভার ছিল তাঁকে কয়েকটি কবিতার অর্থ বোঝাবার পর আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলুম যে এগুলিরও

যেন ঐ ব্যবস্থা না হয় কারণ অনুবাদের কবিতাকে মিলের ছন্দে বাঁধতে গেলে তার তাৎপর্য ক্ষুন্ন হবার সম্ভাবনা। এবং বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীরা কবিতার অর্থানুবাদ করবেন আবার কবিরা তার পদ্যে অনুবাদ করবেন এরকম ব্যবস্থায় ফলও খুব সুষ্ঠু হবার নয়—যা হোক সে ছাড়া তাঁদের আর পথ ছিল না। কারণ তাঁদের দেশের যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বাঙ্গলা জানেন হয়ত তাঁদের আবার বাংলা ভাষায় দক্ষতা সাহিত্য রচনার মত নয়। আর মিল ভিন্ন কবিতা নাকি সে দেশের পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে না। অনুবাদ করবার সময় দেখা যায় সকলেই লক্ষ্য রাখেন অনুবাদটি কেমন করে করলে সেই দেশের পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে। ইংরেজিতে করবার সময় দেখতে হবে কোন গল্প, কবিতা কোন ভাব ইংরেজ মনের উপযোগী তা না হলে তারা বুঝতে পারবে না। তাদের ভাল লাগবে না—সে বই বিক্রী হবে না। শেষের কথাটির জন্যই যত বিপদ যে বই বিক্রী হবার সম্ভাবনা কম সে বইয়ের প্রকাশক নেই এমন কি সে সম্ভাবনা যাচাই করে দেখবারও সাহস নেই। কাজেই অনুবাদ্যকে যথাযথ রেখে অনুবাদ করা চলে না, যে অনুবাদ যেমন করে করলে সেই দেশের পাঠকের রুচিকর হবে তেমনটি হওয়া চাই। বলা বাহুল্য এ শর্ত বেশী দূর অবধি গেলে অনুবাদই চলে না। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টি দান' গল্পটির ইংরেজি অনুবাদের সমালোচনা লিখতে গিয়ে কোন একটি বিলাতী পত্রিকা লিখেছিল যে এ জাতীয় মনোভাব তারা বুঝতে পারে না, যে স্বামীকে একটি উপযুক্ত পদাঘাত করে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত বলে, বিবাহ করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসার পর সেই নারী আবার সেই অপদার্থ স্বামীর সঙ্গে "lived happily thereafter !"

বলা বাহুল্য এই "বুঝিতে না পারা" মানসিক জড়তা এবং না বুঝিবার ইচ্ছা।

অনুবাদের কাজের গুরুতর বাধা শব্দার্থ ও নিহিতার্থের ভারসাম্য বজায় রাখা। বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদের সময় শব্দার্থেরও কম উৎপাৎ ঘটে না। যিনি বাঙ্গলা মোটামুটি ভালই জানেন তাঁর পক্ষেও কবিতায় 'রবে'—অর্থ 'রহিবে'র সঙ্গে 'রবে' অর্থ শব্দের যদি ওলটপালট ঘটে তাঁকে অপরাধী করা যায় না। শুনেছি শরৎচন্দ্রের গল্প অনুবাদ করবার সময় অন্নদা দিদির পদস্খলন হইল—এ কথাটির অনুবাদ হয়েছিল অন্নদাদিদি slipped and fell !! যা হোক ভাষার এ সব মারাত্মক ভুল রোধ করবার উপায় আছে কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনাকে সঠিক যথাযথ রাখার বাধা অনেক। অর্থের প্রতিফলন যথার্থ করবার জন্য উভয় ভাষার সাজুয্য রক্ষা করার সুক্ষ্মবোধ অনেক অনুশীলনায় ঘটতে পারে। একাজ সহজ নয়—তথাচ এসব বাধা অতিক্রম করে বিশ্বমনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পথটি চাই। সেজন্য অনুবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে মননার প্রয়োজন হয়েছে। এ সম্বন্ধে প্রকাশকদেরও অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে নৈলে একদিকে লেখক একদিকে প্রকাশক মাঝখানে উদাসীন পাঠকের নিস্পৃহ মন—"এখন কি করিয়া মিলন হবে দোহে"—কি আছে বিধাতার মনে !—

এই ত শুধু বিদেশীয় ভাষায় ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদের কথা—এখন ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থাও সুবিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন—অধিকাংশ ভারতীয় ভাষাতেই রবীন্দ্রসাহিত্য ইংরেজি মারফৎ অনুদিত হয়েছে এর চেয়ে লজ্জার

কথা আর নেই। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের হিন্দীতে অনেক ছায়ানুবাদ চলেছে—কাজেই সেখানে কায়াকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না—অর্থাৎ সেগুলি আত্মসাৎ করা হয় অনুবাদ বলে ধরা হয় না। খুব উদার ভাবে চিন্তা করলে তাতে হয়ত ক্ষতি নেই। সোনার তরীতে ফসল যদি স্থান পেয়ে থাকে সেই তো যথেষ্ট লেখকের স্থান হোল। কিন্তু লেখকের ক্ষুদ্র অহং যে কপিরাইট এবং রয়েলটির কথা চিন্তা করে নাই বা যশের আকাঙ্ক্ষা রাখে সে এতে পীড়িত না হয়ে পারে না। সরকারী ভাবে যে সব প্রতিষ্ঠান সাহিত্যের অছি নিযুক্ত হয়েছে এবং ইচ্ছামত কাউকে পুরস্কৃত কাউকে অনাদৃত করে সাহিত্যিকদের সায়েস্তা রাখবার ভার নিয়েছে—এ সমস্ত অনাচারের প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। একক একজন লেখকের পক্ষে এ খবর রাখাই সম্ভব নয় যে তার বিনা অনুমতিতে ভারতবর্ষের আঠারটি ভাষার কোন ভাষায় তার বইটির 'ছায়ানুবাদ' হয়ে পুরস্কার পেয়ে গেল।

ভারতবর্ষের মনকে জগতের কাছে পরিচিত করবার জন্য উচ্চ রাজ কর্মচারীদের সাজানো বক্তৃতাই একমাত্র উপযুক্ত বাহন নয়—সাহিত্য, যার ভিতর দিয়ে মানুষের অন্তরাত্মার সত্য উন্মেষ নিরন্তর স্বাভাবিক ভাবেই ঘটছে, তাকেও মানুষের দরবারে পৌঁছে দেওয়া চাই। এর জন্য গোষ্ঠীবুদ্ধি চালিত দলীয় প্রতিষ্ঠান নয় নিরপেক্ষ ও সর্বপ্রকার চিন্তার ছককাটা বন্ধন থেকে মুক্ত প্রতিষ্ঠান দরকার যারা দেশে এবং বিদেশে অনুবাদের কাজ ও প্রকাশের ভার নেবেন। বাংলা ভাষা থেকে সরাসরি যে সব বিদেশীয় ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য অনূদিত হয়েছে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে সে গুলি মিলিয়ে পড়ে দেখা হয়নি অনুবাদ ভুল ত্রুটি বা প্রবণতা মুক্ত কি না। প্রতিষ্ঠান অনেক আছে যারা রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসারের আইন সঙ্গত অভিভাবক কিন্তু তাঁরা হয়ত এ দায়িত্ব অনুভব করেন না।

ধর্ম

ন্যায় নীতি ও ধর্ম এ তিনটি কথাই বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় সমার্থক। অন্য দেশে রিলিজন শব্দ যা বোঝায় ভারতীয় ভাষায় 'ধর্ম' তার থেকে ভিন্নতর। ধর্মকর্ম অর্থে পূজাপদ্ধতি অনুষ্ঠান রীতি বোঝালেও প্রধানতই তার মানে ন্যায়নীতি কর্তব্য। যখন গান্ধারী পুত্রের অন্যায় কাজে রুষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করছেন পুত্রকে ত্যাগ করতে, তখন ধৃতরাষ্ট্র বলছেন কী রাখিব তারে ত্যাগ করি? গান্ধারীর উত্তর "ধর্ম তব।" ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা কী দিবে তোমারে ধর্ম ?' আর গান্ধারীর বলছেন 'দুঃখ নব নব'...মহারাজ ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, সে নহে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ধর্মই ধর্মের শেষ।' এখানে ধর্ম অর্থে ইংরাজি রিলিজন নয় ন্যায় নীতি ও কর্তব্য ধর্ম কাজ করলে সশরীরে স্বর্গলাভ নয়। ধর্মই ধর্মের শেষ অর্থাৎ ন্যায় কর্মের দ্বারা অন্য কোনো প্রাপ্তি হোক বা না হোক ন্যায় কর্মই করণীয় উদ্দেশ্য সেটাই। উচিত কর্ম করব কোনো লাভের আশায় নয় কারণ উচিত কর্ম করাটাই একটা লাভ তাতে যদি বাহ্যিক ক্ষতি হয়ও তবু

অন্তরের দিক থেকে তা ক্ষতি নয়। পুত্র কুকর্ম করেছে রাজা হিসাবে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় ধর্ম—তাতে যদি কষ্টও হয় তবুও তা করণীয়। এই যে ন্যায় নীতি বোধ বা ধর্মচেতনা এর একটা পরিবর্তনীয় রূপ আছে অর্থাৎ দেশে দেশে কালে কালে তা পরিবর্তিত হয়—বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আবার এক দিক থেকে তা নিত্য অব্যয় বা অপরিবর্তনীয়। এই দুটি বিষয়ই এখানে সামান্য আলোচনা করব। যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব তার জৈবিক জীবন ও আত্মিক জীবন দুইই নির্ভর করে অন্যের উপর—একজন মানুষ একাকী বাঁচতে পারে না আবার বহু মানুষের সঙ্গে সংযোগ না হলে সে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। প্রতিপদে একজন মানুষ বহুজনের উপর নির্ভরশীল অন্যের কাছে তার দাবীর অন্ত নেই, কেউ তার জন্য চাষ করছে কেউ তাঁত বুনছে কেউ ঔষধ আনছে কেউ আরোগ্য করছে। এই বৃহৎ বিশ্বে পরস্পরের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন গোষ্ঠী নানা দিকে প্রবৃদ্ধমান—একজন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে একটি কীটের চেয়েও অসহায়। এই যেখান অবস্থা সেখানে প্রত্যেক মানুষের অপর মানুষের সম্বন্ধে দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। বস্তুত প্রত্যেক মানুষই অন্তরে এই দায়িত্ব অনুভব করে—এই অনুভূতির নামই নীতিবোধ। আমি যে কেবল আমার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যই নিযুক্ত থাকতে পারি না, কারণ তাহলে আমার স্বার্থও রক্ষিত হবে না এই অমোঘ সত্য মানুষ জানে এবং বিবেকের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত আছে এই বোধ। মানবাত্মার পূর্ণতা ও প্রকাশ্যে তার অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি। বস্তুত কোন্ মানুষ মনুষ্যত্বের পথে কতটা এগিয়েছে তাতো আমরা বুঝি তার নীতিবোধের দ্বারাই। নিজের সুখ সম্ভোগের জন্য যখন মানুষ অন্যকে বঞ্চিত করে—তখন সেই মানুষের সংকীর্ণতায় আমরা তাকে নিন্দা করি। কিন্তু কেন? প্রত্যেক জীবই তো নিজের প্রাণ-ধারণের জন্য নিজের সুখের জন্য সচেষ্ট অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে তো তার বাধবে না। কিন্তু মানুষের মধ্যে সর্বদা চেষ্টা চলেছে তার জৈব অংশ থেকে দৈব অংশকে বড় করে তোলার এবং সেইজন্যই তার ত্যাগকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যেতেও অনেক সময় তার দ্বিধা থাকে না। সমাজে দুর্নীতি বা নীতি ভ্রষ্টতা বলে যে সব কর্মকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার সবগুলির লক্ষ্য একই নিজের স্বার্থকে অন্য মানুষের তথা সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধ করে তোলা। চুরি করা অন্যায় কারণ যে চুরি করে সে নিজের স্বার্থকে অন্যের স্বার্থের বিরুদ্ধ করে এবং এই কাজ ক্রমে তার নিজেরও বিরুদ্ধে যায় কারণ চৌর্য বৃত্তি ব্যাপক হলে তার নিজের পুটলীটাও রক্ষা করা মুস্কিল হয়। বস্তুত যে কার্য নীতিবিরুদ্ধ তা ব্যক্তিগত স্বার্থেরও বিরুদ্ধ! শুধু সেটুকু বোঝবার দূর-দৃষ্টি সব সময় আমাদের থাকে না। যে ওষুধে ভেজাল দেয় তার খেয়াল থাকে না দৈবক্রমে তার কোনো নিকট আত্মীয়ও ভেজাল ওষুধ খেয়ে বিপন্ন হতে পারে। সেকটাউনে ভেজাল তেল খাইয়ে যে দোকানী চারশ লোককে পঙ্গু করেছিল—ক্রমে ক্রমে তার নিজের স্ত্রীও সেই তেল খেয়ে ফেলে পঙ্গু হয়ে যায়। দুর্নীতি বুমেরাং এর মত ফিরে আসে এ সম্বন্ধে যে সমাজে বেশী লোক অবহিত নয়, সে সমাজ তত বিশৃঙ্খল হয়। এবং সংঘবদ্ধ সমাজের যে প্রধান কাজ পরস্পরকে সাহায্য করা তা আর হয়ে ওঠে না। সম্প্রতি আমাদের দেশে এই বিশৃঙ্খলা এক বিপুল আকার ধারণ করায় ব্যক্তিগত

মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পথ নোংরা ভাঙ্গাচোরা, হাসপাতালে অব্যবস্থা অনেক সময় অকারণ মৃত্যু ডেকে এনেছে জঞ্জালের স্তূপে ঢাকা শহরের পথ, ক্ষণে ক্ষণে আলো পাখা বন্ধ ইত্যাদির ধাক্কায় আমরা বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। রাস্তা তৈরী হচ্ছে দু দিন পর খুবলে উঠে যাচ্ছে এসবই ঘটছে ব্যক্তি মানুষদের আত্ম স্বার্থ লোভ ইত্যাদির তাড়নায়—সামান্য কিছু ব্যক্তিগত লাভের জন্য সমষ্টিগত ক্ষতি ঘটান হচ্ছে, ফলে সেই ব্যক্তিও রেহাই পাচ্ছে না যে লোকটি রাস্তার মাল-মসলা লোপাট করেছিল খুবলে পড়া রাস্তায় মুখ থুবড়ে পরে সে নিজেও। একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে —একবার পি জি হাসপাতালে বসে আছি লোডশেডিং চলছে—একটি বছর দশেকের ছেলেকে শুইয়ে রেখেছে। শুনলাম ওর অপারেশন হবে—খুব সাংঘাতিক হার্টের অপারেশন। ছেলেটি এত ভয় পেয়েছে যে তার চোখ মৃতের চোখের মত ভাব-লেশহীন। একটু বাদে ওর মা এসে একটু ওর চোখের আড়ালে বসলেন—তার কাছে শুনলাম এই নিয়ে তিনবার ওকে অপারেশনের জন্য আনা হয়েছে। প্রথমবার রুগীকে তৈরী করার পর লোড শেডিং এর জন্য অপারেশন হল না, দ্বিতীয়বার ছমাস ধরে ডাক্তারদের ষ্ট্রাইক আর এই তৃতীয়বার দু মাস ধরে বসে রয়েছি ক্রমাগত লোডশেডিং আজও তো দেখছেন অবস্থা, আজও হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি থাকেন কোথায়? সাঁওতালদি আপনার স্বামী কি করেন? ভদ্রমহিলা মুচকি হেসে ঐ পাওয়ার প্ল্যান্টেই। তারপর অর্ধস্বগত উক্তি দেখুন তো এখন ওখানে থাকলে কত ওভারটাইম পাওয়া যেত। আমি ভাবছি স্বার্থান্ধ কি একেই বলে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম এত পাওয়ার কম হচ্ছে কেন আমরা তো শুনি সাবোটাজ হচ্ছে। ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে না না সব কি আর সাবোটাজ? ভেঙ্গে চুরে যায় ঈষৎ উল্লাসভাবে "আরো ভাঙ্গবে।" ইতিমধ্যে সেখানে দুজন ডাক্তার কথোপকথন —তারপর করতে করতে এলেন—তাঁরা সরকারকে ধিক্কার দিচ্ছেন, যে দেশে ছমাস ডাক্তাররা ষ্ট্রাইক করলেও সরকারের টনক নড়ে না ইত্যাদি। সরকারের টনক নড়া অর্থাৎ তাদের দাবী দাওয়া মেটানো। নিজেদের দাবী পাওয়ার জন্য নিশ্চিন্তে তাঁরা কোটি কোটি মানুষকে বিপদে ফেলতে রাজী তার মধ্যে তাঁদের নিজের আত্মীয় স্বজন তো পড়েই। নীতি ভ্রষ্টতার এরকম সব আরো অনেক দৃষ্টান্ত আজকাল সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে—। এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থকে সমাজের স্বার্থের থেকে অতিকায় করে তোলা। যে সমাজে এরকম ঘটনা বেশি ঘটে তা ক্রমেই ধ্বংসের দিকে চলে।

আমাদের এই দেশ যখন দেশের মত ছিল, যখন সমাজের সঙ্ঘবদ্ধরূপ সুশৃঙ্খল ছিল তখনকার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি সুদূরকালের মহাভারত থেকে—। রণক্লান্ত অর্জুন শিবিরে ফিরে যখন অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে পরদিন সূর্যাস্তের আগে পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে যদি বধ করতে না পারি তাহলে যেন ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। বারবার নানা পাপের উল্লেখ করতে লাগলেন 'মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ইত্যাদি প্রচলিত পাপের উল্লেখ ছাড়াও বললেন, যদি আমি কাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করতে না পারি তাহলে আশ্রিতকে বাদ দিয়ে যে লোক নিজে মিষ্টান্ন খায় তার যে লোকে গতি হয় আমার যেন সেই লোকে গতি হয় কিংবা জলে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করলে তার যে পাপ হয় আমার যেন সেই

পাপ হয়। অথচ আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা সে নীতিবোধ হারিয়েছি জল দূষিত করতে পথ আবর্জনা যুক্ত করতে চলাচলের স্থানে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করতে ক'জন বিরত হন। এই সমাজচেতনার অভাবেই তো আজ কলকাতার শহর পূতিগন্ধ হয়।

পূর্বে যে কথা দিয়ে সুরু করেছি সেখানে ফিরে যাই। এরকম নীতিবোধ আগে এক বর্তমান কালের এক চিরকালের ধরা যাক যখন যুদ্ধ বাধে তখন ক্ষণকালীন দেশ প্রেম বলে যুদ্ধজয়ের জন্য কোনো কুকর্ম কোনো মিথ্যাচারেই অন্যায় নয় কিন্তু যারা চিরকালের নীতিবোধকে জাগ্রত রাখতে চাইত তারা বলত 'ধর্মযুদ্ধের' সেটা নীতি নয়। দেশপ্রেমের কারণে বা অন্য কোনো উপযুক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি আমরা অন্যায় বা অবিবেকী উপায় গ্রহণ করি তাহলে আমরা ক্ষণিক স্বার্থের কাছে বড় স্বার্থকে বলি দিই।

উদ্দেশ্য সাধনই মাত্র লক্ষ্য নয় ঠিক উপায় যদি কঠিনও হয় তবু সেই কঠিন পথে চলতে চলতেই উদ্দেশ্য ও উপায় এক ছন্দে বাঁধা পড়ে। যেহেতু ন্যায়বোধ না থাকলে মানুষের সমাজবদ্ধ সুশৃংখল জীবন নষ্ট হয়ে যায় এবং যেহেতু এই বোধ প্রত্যেক মানুষের জন্মগত শক্তি, এর দ্বারা প্রতিটি কর্ম চালিত হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ একেই ন্যায়ের দণ্ড বলেছেন।

এছাড়াও কতগুলি পরিবর্তনীয় নীতি আছে যেমন অর্জুন বলছেন 'ব্রহ্মহত্যার' পাপ কিন্তু আজ আমাদের কাছেও ব্রহ্মহত্যা ও শূদ্র হত্যায় কোনো পার্থক্য নেই উভয়ই নরহত্যা। এখানেও দেখতে হবে একসময়ে একটা 'গোষ্ঠী'র সুবিধার্থে সমাজের অন্য মানুষদের কষ্ট করতে হয়েছে অল্প সময়ের জন্য হয়ত তাতে কোনো সুবিধা হয়েছিল তা চিরকালের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যেমন ব্যক্তিগত মানুষের তেমন কোনো বিশেষ সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর সুবিধার্থে অনেক সময় অনেক নিয়ম করা হয় যাতে কিছুদিন ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্যের ছাপ লাগে। ধরা যাক এক সময়ে বলা হয়েছে বিধবার পুনর্বিবাহ অন্যায়। আজ আমরা তা বলব না। যে নিয়ম যে বিধান যত জেদী মানুষের সুবিধা বা কাজে লাগবে তা ততবেশী সহায় ন্যায়ের ছাপ দিয়ে অনেক অন্যায় নিয়মকে আমরা সমাজে চালিয়ে দিই জাতিভেদ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এইগুলো পরিবর্তনীয়।

কবিতা

আমি আজ বহুদিন পর কবিতা সম্বন্ধে লিখছি। অবশ্য কবিতা মাঝে মাঝে লিখি না যে তা নয় কিন্তু সাহস করে প্রকাশ করতে পারি না—কারণ কবিতার জগৎটা বদলে গেছে। আমরা জন্মেছিলাম কবিতার রাজ্যে সেখানে একজন সম্রাট একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন—তাঁর বিপুল মহিমার বিরাট বিস্তারের নীচে বসেও আমরা অনায়াসে কাঁচা হাতে কবিতা লিখতুম এবং নিঃসংকোচে সেই কবিতা কবি সম্রাটের প্রসাদ দৃষ্টির সামনে মেলে ধরতুম। কিন্তু আজ যারা কাগজ মেপে কবিতা লেখেন অর্থাৎ একখানা সাপ্তাহিকের এক চতুর্থাংশে কতটা ধরবে সেই ভেবে চিন্তে কবিতার আয়তন ঠিক করেন তাদের সামনে মুখ খুলতে ভয় পাই। একেবারেই সেকেলে বলে বরবাদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সে সময়ে যারা কবিতা লিখতেন তাদের অনেকেই ছিলেন ভাবুক। যে ভাবে সেই অর্থে ভাবুক নয় যে ভাবে ভোর হয়ে থাকে সেই অর্থে ভাবুক। এখন ভাবে ভোর হয়ে থাকলে সংসার চলবে না। এখন তাই কবিরা কমার্শিয়াল। উচ্ছ্বাস বলে পাতার পর পাতা লেখার ঝোঁক নেই। মেপে মেপে কবিতা লেখা হয় নৈলে চলবেই বা কেন কাগজের দাম কত বেড়েছে—পত্রিকার পালকরা সে সব ভেবে-চিন্তে তবেই এই এক পৃষ্ঠায় চারটি কবিতার শ্বাস নির্দেশ করেছেন। কেউ কি এখন সাহস করে 'পৃথিবী'র মত কবিতা বা 'তাজমহলের' মত 'ছবি'র মত কবিতা লিখতে পারে? লিখলে কি ছাপতে পারবেন—লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক হয়ত নিজের একটি ঐ আকারের কবিতা ছাপাতে পারেন—আর কে পারবে? পড়বেই বা কে? এখন কবিতার মিল বন্ধ হয়ে গেছে—ছন্দও এখন কিছুই নেই। কতগুলো কথা লাইন ভেঙ্গে সাজিয়ে গেলে কবিতা হয়। কিন্তু লাইনগুলো সোজা গদ্যের মত করে লিখলে কি গদ্য হয়? না তা হয় না কারণ গদ্য লেখা হয় বোঝবার জন্য। স্পষ্ট সেখানে উপমা থাকলেও তা হবে স্বচ্ছ বোঝাবার জন্য কোনো আবরণে একটু কুয়াশাচ্ছন্ন করবার জন্য নয়—অন্যদিকে আবার কবিতা খুব স্পষ্ট হলে তা কবিতাই হবে না। 'সোনারতরী'-তে মেয়েকে, ধান কি, এবং প্রবাহই বা কিসের তা তো পরিষ্কার করে লেখা নেই কিন্তু তার ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে আর কোনো আড়াল আবডাল রইল না। ছন্দোবদ্ধ কবিতার একটু খোলটা পরে আসে ছন্দের নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে আর একটা dimension পেয়ে যায়। আজকের যে সব কবিতায় কোনো মিল নেই, ছন্দ নেই Rhythem এমন কি কোনো Cadanie নেই তখন তা কেবল মিলের শূন্যতার জন্যই গদ্য কবিতা হয়ে উঠতে পারে না—কারণ অর্থ সেখানে মিলের কবিতার মতই বা আরো বেশি আচ্ছন্নাদিত। আমার মতে বর্তমানে ছন্দ শূন্য মিল শূন্য যে কবিতা লেখা হয় তার অধিকাংশই পদ্য কবিতা তো নয় গদ্য কবিতাও নয়।

গদ্য কবিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ T. S. Elliot-এর একটি কবিতা উদ্ধৃত করছি। কবিতাটি প্রথম পড়ে আমার মনে হল একে কি কবিতা বলা যায়? কবিতার বইতে

এর স্থান কেন ? বিশুদ্ধ গদ্য। কিন্তু একটু পরেই ওর মধ্যের গভীর একটা বেদনার ধ্বনি আমার মনে যেন এক অজ্ঞাত তন্ত্রীতে বেজে উঠল। ভাষা গদ্য হলেও ওর মধ্যে কবিতার বেদনা আছে—মুখ্যত এটি কবিতাই, ছন্দ, মিল উপমা থাকুক বা না থাকুক।

সেই যে মাসী সারাজীবন কতগুলো পোষা প্রাণী আর ভৃত্যদের নিয়ে কাটিয়ে গেল—জীবিত কালে যাকে সকলে সম্মান করেছে মৃত্যু মাত্রই সে শূন্য নিরালম্ব—তার নিজের গৃহের উপর তার আর কোনো প্রভাব নেই। সে কোথাও নেই—এখানে কবি ভৃত্য ও পোষা প্রাণীদের কথা লিখেছেন এমনও হতে পারত যে সন্তান-সন্ততির কথা লিখতে পারতেন। যে আলমারী কেউ কখনো খুলত না চাবীটি পড়ে থাকলে সভয়ে খুড়ীর হাতে পৌঁছে দিত। আজ সেই আলমারী খুলে ফেলা হয়েছে তন্ন তন্ন করে তারই অতি প্রিয় ছেলে মেয়ে যারা চিরদিন নিস্পৃহতা দেখিয়ে বলেছে, তোমার কিছুই চাই না তুমি বেচে থাকো মা—তারই জন্য তারাই উইলটা খুঁজছে !

সরল গদ্যে লিখলেও এটা গদ্য কবিতা হতে পারে হয়ত পদ্য কবিতা হতে পারে না। T. S. Eliot-এর কবিতাটার পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করলাম দেখলাম সেটা কবিতা না হয়ে ছড়া হয়ে গেল। কোনো কোনো ভাব আছে যা গদ্যতেই বলা চলে—তাকে ছন্দে বাঁধতে গেলে তার রূপ ও রস একেবারে বদলে যায় আবার কবিতার মিল কবিতাকে গতি দেয়…

আমাদের পুরাতন হয়ত বা বিসর্জন যোগ্য ধারণাগুলি বলে কবিতা শুধু শব্দে লেখা হয় না তা মর্মে লেখা হয়—। গোছা গোছা কবিতার বই ও জার্নাল হাতে পেলেই পড়বার চেষ্টা করি অনেক সময় সক্ষম হই না। খুব কম কবিতাই পাই যেখানে কবি কোনো গূঢ় বেদনাকে, সূক্ষ্ম ভাবকে রূপ দিতে চাইছেন—ঝকমকে কতকগুলো শব্দ পরস্পর অসংশ্লিষ্ট এবং অসংলগ্ন এলোমেলো লাইনে গাঁথা মনে কোনো প্রভাব ফেলে না—লেখকদের মনেই কি ফেলে ? এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে অধিকাংশই আমাদের কিছু বলে না প্রাণে কোনো ঝঙ্কার তোলে না।

আমরা যারা পুরানো পন্থী বা কবিতার ছন্দ ও মিল খুঁজি আমাদের মনে কবিতার সত্তা আমাদের জীবন সত্তার মধ্যে অনুসৃত একটি ভাব। কোনো সময় কোনো পত্রিকার পাতায় নিজের স্বাক্ষর রাখাই তার কাজ নয়—কবির জীবনে তাঁর কবিত্ব বোধ রসবোধ তাঁর সমগ্র জীবন বোধেরই একটি রূপ দুঃখে সুখে সম্পর্কে বিপাকে পড়ে বা জ্ঞান সে মানুষের ক্ষণিক জীবনকে শাশ্বত জীবনের সঙ্গে যুক্ত রাখে—সেই তাকে বার বার উত্তীর্ণ করে তুচ্ছতা থেকে মহিমায়। সে মানুষের আর একটি সত্তা যার মধ্যে এই সত্তা যত প্রবল যত তীক্ষ্ণ যত প্রাণবন্ত তার উপলব্ধি কবিত্ব ভাব তার ততই অর্থবহ। কোনো একটি মুহূর্তের অনুভূতিকে দু'চার লাইনে গাঁথা হলেই কবিত্বের পূর্ণতা নয়। জীবনের টানা পোড়েনে অনুসৃত যে ভাব ক্রমাগতই তাকে অশুদ্ধ থেকে শুদ্ধে, অপূর্ণ থেকে পূর্ণে নিয়ে যাবে সে বাইরে থেকে আহৃত কোনো শক্তি যে নয়—সে তার নিজের অন্তরের অভিব্যক্তি। সত্তার এই দ্বৈতরূপের বোধ কোনো একদিন স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম সেদিন এই কবিতাটি

লিখেছিলাম।

যদিও পত্রিকার এক চতুর্থাংশে যেতেও পারত কিন্তু সাহস করে কোথাও পাঠাই নি। একে মিল আছে তায় সহজবোধ্য তবে আমার তরুণ বন্ধুরা যারা লেখা চাইতে এসেছিলেন তারা সাহস দেওয়ায় এইখানে প্রকাশ করলাম।

আমি একলা নই,	আমার মধ্যে সে
আমি যখন চলি,	আমার সঙ্গে চলেছে।
আমি যখন ঘুমাই	তখন সে জাগ্রত থাকে
আমি যখন ক্ষুন্ন	তখন ম্লান দেখিনা তাকে
আমার বুকে ক্রোধ	যখন চোখে ঈর্ষা জ্বলে
অসীম আমার	সেই কি তখন নেভায় ক্রোধানল
প্রত্যাহত ভালোবাসা	যখন খোঁজে নীড়
তখন তারি আলিঙ্গনে	শান্তি সুনিবিড়
আমার মৃত্যু শয্যা দেখি	তার শিখরের কাছে
অনির্বাণ শিখার মতন	সেই জড়িয়ে আছে।

(স্বর্গীয়া লেখিকার পান্ডুলিপিটি খুবই দুষ্পাঠ্য। যতটা সম্ভব উদ্ধার করার চেষ্টা হয়েছে।)

রবীন্দ্রনাথের ছবি

অনেকে আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে নানা কথা শুনতে চান, নানা কথা তাঁরা শুনেও আসেন এবং আমাকে শোনান। এতবড় একজন বিরাট প্রতিভার সম্বন্ধে মানুষের ঔৎসুক্য ও আগ্রহের শেষ নেই। কিন্তু আগ্রহ মেটাবার উপায় ক্রমেই কমে যাচ্ছে কারণ তাঁর সমসাময়িকরাও প্রায় সকলেই অন্তর্হিত। বর্তমানে একজন আমাকে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। আমি দু'এক জায়গায় তাঁর ছবি সম্পর্কে কিছু বলেছি ও লিখেছি, কিন্তু খুব বেশী না।

আমায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছবি তিনি বুঝতে পারেন না। প্রথমে তার কথাটারই উত্তর আমার মনে ঘোরাফেরা করছে। বুঝতে পারা বলতে কি বোঝায়? শব্দের অর্থ বোঝা এক জিনিস; সেখানে শব্দ বা বাক্যের একটা প্রতিরূপ আমরা পাই। যে কথাটা উচ্চারণ করলাম, যেমন ফুল। ফুল কথাটা শব্দ কিন্তু বাইরে একটা তার প্রতিরূপ আছে বলেই কথাটা অর্থযুক্ত। কাজেই ফুল কথাটার অর্থ বোঝা গেল। কিন্তু সেতারে যখন ঝঙ্কার উঠলো তার কি কোনো প্রতিরূপ বাইরে আছে? তাহলে তা বুঝলাম কি? কিন্তু দরদী শ্রোতার কানে সেই শব্দ বাক্যার্থের চেয়েও অর্থবহ। সঙ্গীত যেমন তার অর্থ ভারহীন সপ্তপক্ষ মেলে দিয়ে মানুষের মনকে উধাও করে নিয়ে যেতে পারে তেমনি রেখা ও রঙেরও সেই শক্তি আছে। সেকথা রবীন্দ্র চিত্রকলা শিল্পীদের চোখে পরিস্ফুট করে দিয়েছে বহু দেশে।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিল্পকলায় ছিল মানুষের বা প্রকৃতির অবিকল অনুকরণ। বড় বড় মহিলাদের ছবি, রাজা ও রাণীর ছবি, দেবদেবীর প্রতিমূর্তি

সবই মনুষ্য আকৃতির হুবহু অনুকরণ হতো। আমাদের দেশে বোধহয় ঠিক কোনদিনই এরকমটি হতো না। আমাদের রাজপুত চিত্রকলা, মোঘল মিনিয়েচার, কালীঘাটের পট সব জায়গায় আমরা দেখি সম্ভব অসম্ভবের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ বাইরে যে বস্তুটি দেখছি সেটারই নকল নয়। শিল্পীর অন্তরের রসে মজ্জিত হয়ে সে শিল্প শিল্পীর নিজেরই সৃষ্টি। লোক সঙ্গীতের মধ্যে শব্দের এই জিনিসটিই আমরা দেখতে পাই।

তবে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকলা লোক শিল্প নয়। সেখানে 'Sofistication'-র ছাপ পর্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি কিভাবে শুরু হয়েছিল সেটি মনে করলেই বোঝা যায় যে, সে তো বোঝাবার জন্য হয়নি, বরং না বোঝাবার জন্যই হয়েছে। যে লেখাটা মুছে ফেলতে হবে কলম দিয়ে, তাকে কেটে-কুটে ফেলতে ফেলতে পরিত্যাজ্য অক্ষরগুলিকে যাতে বোঝা না যায়, সেইভাবে ঢাকা দিতে দিতে দেখতে পেলেন কোথা থেকে অজানার মধ্য থেকে একটা ছবি ফুটে উঠেছে। সে ছবি অন্য কোন বস্তুকে বোঝায় না, শুধু তার রেখার সঙ্গতির ভিতর দিয়ে সৌন্দর্যের একটি অনুভবকে জাগ্রত করে। কত ধৈর্য ধরে কত সময় নিয়ে এই কাটাকুটিগুলি করতেন। একটি অসঙ্গত রেখা হঠাৎ বিপথে চলে গেলে তাকে সঙ্গতির ভিতর ফিরিয়ে আনতে চলত তাঁর সাধনা, সে সঙ্গতিটি কি? কোন বস্তুর সঙ্গে তাকে মেলানো নয়। রেখায় রেখায় যে মিল সেই মিলকেই খুঁজে বের করা। জগত জুড়ে রেখাকে আমরা নানা বস্তুর অঙ্গে মিলিত করে দেখি। কিন্তু বস্তুবিচ্ছিন্ন রেখার নিজস্ব রূপ কবি দেখতে পেলেন এই কাটাকুটির মধ্য দিয়ে।

ছবি আঁকার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন বেশীর ভাগ কলম ও পেন্সিল। কলম দিয়ে লিখতে লিখতেই তো কাটাকুটি করা। সেই কলম দিয়েই ছবি তৈরী হতে লাগল। শুধু আঁকাবুকির ছবি নয়, যখন কোন মুখ, ফুল বা আজব জন্তু আঁকছেন তখনও বহু ক্ষেত্রেই দেখি কলম দিয়েই এঁকেছেন। শুধু রেখায় নয়, ফাউণ্টেন পেনের দাগেই তার 'সেড' (shade) দেওয়া হয়েছে। ছবির কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার। তাও কলমের কালি ঘষে ঘষেই মায়ালোক গড়ে তুলেছেন। তার কারণ বোধহয় এই রূপের আকর্ষণ তাঁর মনকে টানছে কিন্তু কোন বস্তু স্থায়ী বা অস্থায়ী সেদিকে দৃষ্টিমাত্র নেই। যে কোনো কাগজ, বই-এর মলাট, চিঠির পিছন, লেখার খাতাতো বটেই তাঁর ছবি আঁকার উপকরণ। উপকরণের স্বল্পতাও রবীন্দ্রচিত্রকলার একটি বিশেষত্ব। কাটাকুটির স্তর পেরিয়ে যখন ছবির স্তরে এসে পৌঁছল তখন কবি বৃদ্ধ, সত্তরের দিকে চলেছেন। তখন দেখতে পেলেন, যে রেখাগুলি চিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে তার ভিতরে তাঁর আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্টা।

এইখানে একটি কথা বলছি যে, যাঁরা তাঁকে ছবি আঁকবার সময়ে দেখেননি, তাঁরা ঠিক বুঝতে পারবেন না তাঁর ছবিগুলি কতটা 'অকল্পিত' ছিল। কলম ঘষতে ঘষতে বা রঙিন পেন্সিল ঘষতে ঘষতে কিংবা রঙের ছোপ লাগাতে লাগাতে কাগজের উপরে যে চিত্রটি ফুটে উঠল সেটি তাঁর কল্পনায় ছিল না। সাধারণতঃ যে কোনো শিল্পী যখন ছবি আঁকতে বসেন তাঁর মনে কোনো ভাব থাকে যেটাকে তিনি চিত্ররূপে ফুটিয়ে তুলতে চান। রবীন্দ্রনাথ নিজে দু'একটি পোর্ট্রেট

এঁকেছেন। সেগুলিও আকস্মিক কিনা আমি জানি না কিন্তু সেগুলি ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি ছবি আকস্মিক বা Accidental. যেমন কাটাকুটি মুছতে মুছতে কি আকৃতি বেরুবে তা কবির জানা ছিল না, তেমনি রং, তুলি বা রঙীন কলম দিয়ে ঘষতে ঘষতে কি মূর্তি ফুটে উঠবে তাও তিনি জানতেন না। একথাটা আমি জোরের সঙ্গে বলছি এইজন্য যে, রঙের দিকে বা পেন্সিলের দিকে না তাকিয়েই তিনি ব্যবহার করতেন। যেমন একটা ছবি আঁকতে শুরু করেছেন, পাশে বসে তাঁর পেন্সিল কেটে দিচ্ছি কিংবা রঙ গুলে দিচ্ছি. তিনিও টেবিলে কাগজ রেখে ছবি আঁকছেন। আমাকে বললেন, বুরুশে মাখিয়ে একটা রঙ দাও; দাও, দাও। এত ব্যস্ততা যে অপেক্ষার সময় নেই। কি রঙ দেবো তা জিজ্ঞাসা করলে বলবেন অত যদি বলবো তো তুমি আছ কি করতে? অচেনা একটি রঙ বুরুশে লাগিয়ে দিলেন সেই ছবির উপর চাপিয়ে, যেটা চেনা হয়ে উঠছিল। আমাদের কাছে এটাতো অসম্ভব মনে হতো। মনে হতো এত আজগুবি ভাবে রঙ পড়েছে যে ছবি বোধহয় আর উদ্ধার হবে না। কিন্তু নানারকম রঙ ঘষে ঘষে সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভব মিশিয়ে যে বিচিত্র ছবিগুলি তৈরী হয়ে উঠেছে তার দ্যুতিময়তা অস্বীকার করা যায় না। দু'একটি ছবি যে নষ্ট হতো না তাও নয়। কিন্তু বেশীর ভাগই একটা সৌন্দর্যের পথে অন্বিত হতো। এই রঙের ছবিগুলির মধ্যে অনেক বিচিত্র মুখ আমরা দেখি, দেখি নানা জন্তু, আকৃতি কিন্তু সেগুলি কোনো পরিচিত জন্তু নয়, শুধু একটা জন্তুর ভাব, কখনো কখনো জন্তুটাকে চেনা যায় না কিন্তু তার আর্তস্বর যেন শোনা যায়। তেমনি যে ছবি কোনো কিছুর প্রতিরূপ নয়, সে ছবিও যেন কোনো ভাবের প্রতিরূপে হয়ে রেখা ও রঙের অভিনব ব্যঞ্জনাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চায়। যদি কোনো ছবি কোনো বস্তুর প্রতিরূপ হয়, যেমন রাধাকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, তাহলে সেখানে সেই ছবি সম্পূর্ণ বোঝা হয়ে গেল, তার মধ্যে বাকী রইলো না কিছুই। কিন্তু যে ছবি কোনো বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিরূপ নয়, সে যেন ধরা ও অধরার সংমিশ্রণ। দর্শকের মনকে তা উধাও করে নিয়ে যায়। শুধু রবীন্দ্রনাথের ছবি নয়, আধুনিক যুগের বহু ইউরোপীয় চিত্রকলাতেই আমরা এই বিশেষ গুণটি দেখতে পাই। শিল্পের সেই আবেগমুখী ধর্ম যাকে কিছুতেই দুই মুঠিতে ধরা যায় না, এই সব ছবিতে রেখার সংযোগে সেই ধরা না ধরার আবেগ আছে। একটু লক্ষ্য করে দেখলে বা দেখতে দেখতে অভ্যাস হলে তা বোঝা যায়।

পুস্তক সমালোচনা

কৃষ্ণ কৃপালানি-রচিত রবীন্দ্রনাথের জীবনী সমালোচনার অসুবিধা একটু আছে। বইটি লেখা হয়েছে ইংরেজিতে, আর আমি লিখছি বাংলায়। রবীন্দ্ররচনা থেকে যে অসংখ্য উদ্ধৃতি লেখক ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, তার মূল বাংলা খুঁজে পাওয়া সময়সাধ্য, শ্রমসাধ্য। মোটামুটি বোঝা গেলেও নিখুঁত উদ্ধৃতির বাংলাটা দেখা দরকার।

বইটিতে ছোট দু-একটি ঘটনা ছাড়া এমন কোনো তথ্য নেই যা আমাদের অজানা বা নতুন; কিন্তু বইটি তো শুধু বাঙালীর জন্যই লেখা নয়, অবাঙালীর কাছে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র বিবিধ কর্ম, তাঁর ভাব ও ভাবনা, তাঁর কৃতার্থ ও

অকৃতার্থ প্রয়াস—সমস্তরই একটা মোটামুটি ধারণা তিনি পাঠককে দিতে চান। লেখকের সে ইচ্ছা অবশ্যই সুসম্পন্ন।

লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, হৃদ্য—রচনাশৈলীর বঙ্কিম কৌশলে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বা কসরত দেখাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। ঝরঝর করে বয়ে চলেছে সরল স্বচ্ছ ভাষা, যে পাঠক বুঝতে চায় তার পক্ষে এমন বই কাঙ্ক্ষিত।

কৃষ্ণ কৃপালনি রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ঘনিষ্ঠ জীবিত আত্মীয়, এবং অতিশয় প্রিয়জন। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কতদূর পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত মনোভাব ছিল তা তাঁর নিজেরও হয়তো জানা নেই। কবি বলতেন, তিনি দুজনকে জানেন যাঁরা 'পারফেক্ট জেণ্টলম্যান'। তার মধ্যে প্রথম জনের নাম উল্লেখের প্রয়োজন নেই এখানে, দ্বিতীয় জন কৃষ্ণ কৃপালনি। এই যেখানে দাদামশায়ের মতামত, সেখানে অন্যপক্ষেরও দাদামশায়ের প্রতি পক্ষপাত থাকা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মানতেই হবে, এক্ষেত্রে তা হয়নি। কৃপালনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন। বইটি শুধু জীবনের ঘটনাবলীর সংগ্রহ নয়—কবির কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে লেখকের সুস্পষ্ট মতামতও রয়েছে।

প্রভাতকুমারের বৃহৎ রবীন্দ্রজীবনীগ্রন্থের প্রথমেই উৎসর্গের সেই আশ্চর্য কবিতাটির দুটি স্তবক উদ্ধৃত আছে ঃ "বাহির হইতে দেখো না এমন করে, আমায় দেখো না বাহিরে। আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে, আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে, আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে, কবিরে যেথায় খুঁজিছ সেথা সে নাহিরে।" জীবনীগ্রন্থের সামনে এই উদ্ধৃতির দ্বারাই প্রভাতকুমার তাঁর অকৃতার্থতার কথা সবিনয়ে স্বীকার করে নিলেন। যদিও আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে ঐ বইয়ের সাহায্য অপরিহার্য।

কৃপালনিজীর বইটি পড়তে পড়তেও আমার উৎসর্গের কবিতাটি বারবার মনে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে জীবনী লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিশেষ করে, কবির জীবন তো বৃত্তান্ত দিয়ে ধরা যায় না। যাঁরা কর্মবীর, তাঁদের জীবনই শুধু লেখবার যোগ্য, কারণ তা অনুকরণীয়। একথা ঠিক, কবির জীবন অনুকরণ করা যায় না। তবে রবীন্দ্রনাথও যে কর্মবীর, সে সম্বন্ধে আজ কি কারও সন্দেহ আছে? আমাদের তো মনে হয়, কর্মই তাঁর কাব্যের উৎস। বিচিত্র কর্মের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যকে বাস্তব ও শক্তিশালী করেছে, তাঁকে বহুপথে নিয়ে গেছে। ভাবের ও কর্মের বৈচিত্র্যের কারণে ভাষা ও বিচিত্র গতি লাভ করেছে।

বর্তমান জীবনীতে তাঁর ধর্ম কর্ম কবিত্ব ও দর্শন—সমস্তই আলোচনা করা হয়েছে. প্রভাতকুমারের গ্রন্থের মতো অত পুঙ্খানুপুঙ্খ না হলেও রবীন্দ্রজীবনের প্রায় সমস্ত প্রধান ঘটনার, এবং তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ ও বিবরণ আছে। বিদেশীরা তথা অন্যভাষাভাষীরা এই বইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু তথ্য এবং কিছু তত্ত্বও পাবেন। তথ্য মোটামুটি সঠিক, তবে তত্ত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক সম্ভব।

আমরা যদি উৎসর্গের কবিতাটিকে আদর্শ হিসাবে ধরি, তাহলে জীবনীগ্রন্থের মূল্যায়নের একটা মাপকাঠি থাকে। কোনো সমালোচক বা জীবনীকার যদি কবির অন্তর্জীবন (যে জীবনের সূক্ষ্ম স্পন্দনগুলি ফুলের বুকের কাছে গন্ধের মতো কম্পমান, মেঘগর্জিত ঝঞ্ঝার মতো যার প্রবলতা, শারদ ধান্যের আভা যার নয়নে—

কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে—) সেই জীবনটিকে যদি জানতে চান, তাহলে একমাত্র উপায় তাঁর কাব্যকে জানা। জীবনীকার আদ্যোপান্ত প্রায় তাই করেছেন। বিশেষ করে প্রথম অংশে তিনি কবিকে দেখেছেন শুধু তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়েই। প্রথম অংশ তো জীবনস্মৃতির সংক্ষিপ্তসার বলা চলে। তখনও জীবনের কর্ম শুরু হয়নি, শুধু বেজে উঠছে নানা সূক্ষ্ম সুর, নানা অস্ফুট কল্পনা। 'কবিকাহিনী,' 'বনফুল,' 'বাল্মীকিপ্রতিভা,' 'ভগ্নহৃদয়' ইত্যাদি অপরিণত রচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে।

অতি বিশ্বাস্য ও নিপুণ-ভাবে কাদম্বরী দেবীর কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্নেহ ও করুণা, এবং রবীন্দ্রনাথের তাঁর প্রতি উৎসৃষ্ট গভীর প্রেম ও ভক্তির একটি অকপট কাহিনী তাঁর বহু রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে প্রত্যয়জনক করা হয়েছে। কিছুদিন থেকে এই ঘটনাটি নানা রঙচঙ আর মুখরোচক রসে রঞ্জিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে কৌতূহলের উদ্রেক করেছে—কখনো বা নিন্দনীয় কুৎসা হিসাবে মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। একই ঘটনা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। কাদম্বরী দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা জীবনের পর্বে পর্বে নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে তাঁর কবিতায় গানে নিত্যধারা। কারণ, তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে'। জীবনীকার এ সম্বন্ধে বহু উল্লেখ্য রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উনআশি বছরের রচনাতেও সেই নারীকেই পাওয়া যাচ্ছে তিনি বহুদিন পূর্বে অন্তর্হিতা। যাঁর সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক ও সান্নিধ্য অতি অল্প। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে আর সম্পর্কে বড়ো, তাই তাঁর কাছে আদরণীয় একটি বালকমাত্র। সেই কারণেই তিনি বালক-কবির শুধু প্রেম নয়, সৌহার্দ্য নয়—ভক্তিরও পাত্র। প্রেমের পূর্ণ উত্তরণ ভক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে পরবর্তী জীবনে ভক্তির পাত্রী, এমন কি প্রেরণার উৎসও কাউকে খুঁজে পাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। এমন কি, কাদম্বরী দেবী যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে সারা জীবন ধরে এই পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত থাকা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে বলেছিলেন, "ভাগ্যিস নতুন বৌঠান মারা গিয়েছিলেন, তাই তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখছি। যদি বেঁচে থাকতেন হয়তো বিষয় নিয়ে মামলা করতুম।" একথাটা পরিহাস করে বলা হলেও নিছক পরিহাস নয়। কাদম্বরী দেবী বালক-কবির কবিত্ব উন্মেষের মুহূর্তে নারীস্পর্শের কোন বিচিত্র শক্তিবলে এক অধরা মাধুরীর চির উৎসমুখ খুলে দিয়ে অন্তর্হিতা। তাঁর কায়িক অনুপস্থিতিই যেন এক অলৌকিক স্মৃতিসত্তা হয়ে মাটির বন্ধন থেকে কবিকে ঊর্ধ্বে 'স্বর্গসভার নিমন্ত্রণ' জানিয়েছে. কবির অন্তরঙ্গ ভাবনাকে রূপ দিয়েছে, প্রাণের নিশ্বাসবায়ু সুমধুর করেছে। বাল্যকালের ভক্তির পাত্রী তাই চিরকালই প্রণম্য, চিরকালই তাঁর চরণে আত্মনিবেদন। এই অশরীরী অবিচল প্রেম, এই অঙ্গবিহীন আলিঙ্গন তাঁর কাব্যের চিরপ্রেরণা। তাই কখনো এ চটুল যৌবন-চাঞ্চল্যে চঞ্চল, কখনো পূজার অর্ঘ্য নিবেদন, কখনো জীবনের ধ্রুবতারকার প্রতি ঊর্ধ্বমুখী পূজা যেন ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন। এখানে প্রেমই ঈশ্বর।

তাই বলে জীবনীকার যখন জীবনদেবতার কবিতাগুলিতেও কাদম্বরী দেবীকে

দেখেন, তখন আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হই না। কেন যে মানসসুন্দরীতে জীবনীকার কাদম্বরীকে দেখছেন—যখন তিনি নিজেই উদ্ধৃত করেছেন কবির বক্তব্য—"The beloved in Manasi is of mind only. It is my first tentative incomplete image of God."

নাচ গান-কাব্য ও জীবন-চর্যার উল্লেখ করে জীবনীকার বলছেন কবিসত্তার প্রধান ধর্ম প্রেম। চিরপ্রেমিক কবি এই পৃথিবীকে ভালোবাসেন, প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, মানুষকে ভালোবাসেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গেও তিনি প্রেমে মিলিত হন। কবির অন্ত-র্জীবনের এই ধারা তাঁরই কাব্য বিশ্লেষণ করে স্বচ্ছ সাবলীলতায় বলে চলেছেন জীবনীকার। কবির যে কর্মজীবন শিলাইদহে শুরু হয়ে বিশ্বভারতীতে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করল, তারও ক্রমবিকাশের একটা ছবি এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জীবনীতে অবাঙালীর কাছে স্পষ্ট হবে। কৃপালনিজী অসামান্য গান্ধীভক্ত হলেও, স্বীকার করেছেন, মূক মূঢ় দেশবাসীর কাজে, গান্ধীর আবির্ভাবের বিশ বৎসর পূর্বেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়, অর্থ ও সংকল্প নিয়োগ করেছেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধেও তাঁর সংগ্রাম গান্ধীজীর বিশ বৎসর পূর্বে শুরু হয়েছে। মাত্র বিশ বৎসর? আমার তো মনে হয় আরও অনেক আগে থেকেই। এই দুর্ভাগ্য দেশে জাতিভেদের পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর অমোঘ সাবধানবাণী উচ্চারিত। এ ছাড়া, আর একটি কথাও এ বইতে পেলাম যা আমরাও পূর্বে 'রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী' নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম—গান্ধীজীর আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এইরকম একটি সত্যনিষ্ঠ চরিত্র রবীন্দ্রকাব্যে যাওয়া-আসা করেছে। 'রাজর্ষি'র বিল্বন ঠাকুরও কতটা ঐরকম—ঋজু এবং সত্যবাক্। কিন্তু 'প্রায়শ্চিত্তে'র ধনঞ্জয় বৈরাগী একেবারে গান্ধীজীরই প্রতিরূপ। ঐ নাটকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিকল্পনা সুস্পষ্ট, যা পরে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একটি অভাবনীয় রূপ নেয়।

রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি ভবিষ্যতের অনেক দৃশ্যই রাজনীতির প্রবক্তাদের আগেই দেখতে পেয়েছিল; তার ভূরি ভূরি প্রমাণ গ্রন্থকার রবীন্দ্ররচনা থেকে উপস্থিত করেছেন।

অনেকের ধারণা, নোবেল প্রাইজ পাবার পর রবীন্দ্রনাথ ঘর থেকে বাইরে এলেন; তাঁর চিন্তা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে, জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে তাঁকে বিশ্বাভিমুখী করল—তিনি প্রাণের মাঝে বিশ্বলোকের সাড়া পেলেন।

একথা আংশিক সত্য, পুরোপুরি নয়। প্রথম দিকের রচনার মধ্যে, এমনকি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মধ্যেও, এই বিশ্বচেতনার উন্মেষ আমরা দেখি। আর আশ্চর্য বই 'গোরা'—যেখানে একটি প্লটের মধ্যে জাতিধর্মবর্ণের সংস্কারের ভিত্তিভূমিই চুরমার করে দিলেন। হিন্দুত্বের আর ব্রাহ্মণ্যধর্মের অহংকার যখন ভেঙে গেল, তখনই গোরা আনন্দময়ীর উচ্চারিত সেই পরম সত্য বুঝতে পারল যে, শিশুকে কোলে নিলেই বোঝা যায় মানুষের জাত নেই—অর্থাৎ ভালোবাসলেই মানুষের গভীর ঐক্যের সম্বন্ধে জন্মায়। ভেদবুদ্ধি দূর হয়ে যায়।

'গোরা' বইটি যে কতকটা নিবেদিতার, বা নিবেদিতা-বিবেকানন্দর মিলিত জীবনছায়া, তা আমাদের জানা ছিল, এবং 'গোরা'র পরিশিষ্টটুকু যে নিবেদিতার অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাও শুনেছিলাম; কিন্তু

গোরার কাহিনী যে নিবেদিতাকে গল্প শোনাতে গিয়ে কবির মনে এসেছিল, তা ঠিক মনে ছিল না। প্রথম দিকের 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলি জগদীশচন্দ্রের ফরমাশ অনুসারে লেখা হত। প্রতিদিন আহারান্তে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার পরে বৈকালিক চা-সহযোগে তিনি একটি নতুন গল্প শুনতে চাইতেন। রবীন্দ্রনাথের দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের বালাই নেই, তিনি অতিথির জন্য গল্প লিখতেন। গল্পগুলি গ্রামবাংলার ছবি, তার মধ্যে জগদীশচন্দ্র কোথাও নেই, কিন্তু 'গোরা'র কাহিনী নিবেদিতাকে শোনাতে গিয়ে রূপ নিয়েছে জেনে ঐ বইয়ের মধ্যে নূতন করে নিবেদিতার হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলাম। মনে হল কবি নিবেদিতার মধ্যে 'রিলিজিয়ন অব ম্যান' গ্রন্থে তাঁর প্রচারিত দর্শনের একটি প্রত্যক্ষ রূপ দেখেছিলেন।

নোবেল প্রাইজের উপর বক্তব্যগুলো বোধহয় জীবনীকার বিদেশী কাগজের কাটিং থেকে পেয়ে থাকবেন। ঐ কাটিংগুলো দেখা, এবং সেগুলোকে অবলম্বন করে লেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু ইদানীং এ বিষয়ে অনেক চর্চা হওয়ায় রথেনস্টাইন, ইয়েটস প্রভৃতির ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি, যার উল্লেখ এ বইতে নেই। না থেকে ভালোই হয়েছে। মানুষের মধ্যে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের পাশাপাশি বাস—ক্ষুদ্রের খবর নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে রবীন্দ্রজীবনের সুষমা এবং সামঞ্জস্যের ছবিটি ব্যাহত হয়। অবশ্য জীবনীকার যে বারবার অসমঞ্জস চিন্তার অবতারণা করেননি তা নয়। যদিও তিনি নিজেই লিখেছেন, "Tagore made the world's destiny his own and felt deeply the agony if there was suffering or injustice in any part of the world."

এই বিশ্বচেতনা যে তাঁর পক্ষে কত সত্য ছিল, তা তাঁর শেষ জীবনের লেখাগুলিতে, বিশেষত কালিম্পং থেকে প্রচারিত 'জন্মদিন' কবিতাতে ও 'সভ্যতার সংকটে,' আমরা অনুভব করি। কিন্তু এই ভাবকে জীবনীকার যেন মাঝেমাঝেই সন্দেহের চক্ষে দেখেছেন। এ ছাড়া, বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ করতে গিয়ে আমেরিকার অর্থগৃধ্নুতা, ব্যবসায়িক বৃত্তি সম্বন্ধে উল্লেখ লেখক মনে করেন সুষ্ঠু হয়নি (incongruous): এমনকি ন্যাশনালিজম' বক্তৃতা যদিও ক্রান্তদর্শীর নির্ভুল সত্যবাণী, তবু লেখকের মতে, তা সময়োপযোগী হয়নি। এ ছাড়াও, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের বারবার নানা দেশ পর্যটন, সেখানে বক্তৃতাদি যেন লেখকের তত মনঃপূত নয়। দ্রষ্টা ও সমাজসেবক—যাকে তিনি বলেন 'do-gooder'—যেন কবির চাইতে বড় হয়ে উঠতে চাইছে। যেন নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁর শিল্পী-সত্তা আড়ালে চলে যাচ্ছে, তিনি কবির চেয়ে দ্রষ্টা এবং প্রফেট হয়ে উঠতে চাইছেন। 'One world'-এর চিন্তা যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে, এবং এই মত যেন প্রচার করতেই হবে। এই মতবাদ 'world fashion' হয়ে উঠবার অনেক আগেই তিনি এর প্রচার করেছেন। এখানে 'ফ্যাশন' অর্থে লেখক কী বলছেন ঠিক বোঝা গেল না—যারা মানব-ঐক্যের কথা বলে, তারা কি হুজুগে পড়ে বলে? তা যদি হয়ও, তবু সে হুজুগ বা ফ্যাশন মূল্যবান।

জাতীয়তাবাদের বীভৎস রূপ ফ্যাসিজমের উৎকট চরিত্র দেখার আগেই সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে তারই ছায়া কবি দেখেছিলেন। তাই আন্তর্জাতিকতা, বিশ্ববোধ

একটি উত্তরণ—ফ্যাশন নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো দ্রষ্টারা বহু মানুষের মনে এ সত্যের বীজ বপন করতে পেরেছিলেন বলেই আজও পৃথিবী মোটামুটি বাসযোগ্য আছে।

জীবনীকারের এও মনে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ যদি নোবেল প্রাইজ না পেতেন, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা না করতেন, এবং কবি যদি প্রফেটের কাছে, আর সুরকার বক্তার কাছে পরাজিত না হতেন, তাহলে তিনি আরো বড়ো লেখক, আরো উন্নত মানুষ হতে পারতেন ; কবি তাঁর শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা হারিয়ে ফেলছিলেন—**nevertheless, it is true that something was missing in his later works, that rare something which comes from exclusive devotion to one's art, from ceaseless striving for perfection."**

এই "ceaseless striving for perfection" যে কীরকম, তা রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন। অবিরাম কাটাকুটি, পাতার পর পাতা বদল। বার বার নিজে কপি করে চলেছেন তো চলেছেনই। কৃপালনিজীর মতে, তাঁর পরের লেখাগুলোতে something was missing that rare something, অথচ অনেকের কাছেই তাঁর শেষের রচনাগুলো আরো অর্থবহ, আরো সার্থক শিল্প, আরো জ্ঞানগর্ভ। দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র বিবিধ অভিজ্ঞতা আলোর চমকের মতো আমাদের মনকে উদ্ভাসিত করে এবং দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সামনের দিকে। 'বলাকা'র পর থেকে তাঁর ভাষা ও ভাবের অনুষঙ্গে ক্রমপরিবর্তিত।

জীবনীকার বারবার নানা ছলে এই কথাটি বলেছেন যে দেশবিদেশে ক্রমাগত ভ্রমণে তাঁর ধ্যানশক্তি, সৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়েছে। এ ধারণা হয়তো তিনি রোমাঁ রলাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন ; রলাঁও তাঁর ডায়রিতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণস্পৃহার নিন্দা করেছেন—তাহলে ধ্যান করবে কখন? অবশ্য ভ্রমণে অনীহা নানা মানুষের নানা কারণে হয়ে থাকে, তাই রলাঁ এত ভারতবন্ধু হয়েও গরম লাগার ভয়ে ভারতে এলেন না, এবং ফ্রান্সে বসে ভারত চিন্তা করতে করতে কালীর ধ্যানে পৌঁছে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন, "আমি তো কবিতার নীড় বেঁধে দিন কাটাইনি।" প্রকৃতপক্ষে একটি নীড় অর্থাৎ একটি বাড়িও পর্যাপ্ত নয় তাঁর কাছে। তিনি ক্রমাগত বাসা বদল করেন, ঘর বদল করেন, নতুন নতুন কাজ হাতে নেন। হেথা নয়, হেথা নয়—তিনি চঞ্চল, তিনি সুদূরের পিয়াসী। এ বিশ্বচরাচরে যত ভাব আছে, যত সংগীত আছে তিনি সব দুহাত দিয়ে ধরতে চান, অনুভব করতে চান—'ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী ; তাঁর দেশে দেশে ঘর আছে, তিনি অজানাকে জানতে, দূরকে নিকট বন্ধু করতে চান—এই প্রসারতা তাঁর আজন্ম সঞ্চালন। তিনি তুষারমৌলি হিমালয়ে অচলাসনে বসে থাকতে চান না, নির্ঝরের মতো বেরিয়ে পড়তে চান। এই তাঁর অন্তর্যামীর অভিপ্রায়। এর সঙ্গে নোবেল প্রাইজের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে নোবেল প্রাইজ তাঁর কাজের সহায়ক হয়েছে অবশ্যই। কিন্তু তা একজন ধ্যানমগ্ন নাসাগ্রে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি তপস্বীকে রবীন্দ্রনাথ করেনি। দেশে বিদেশে শারীরিক এবং মানসিক দুর্ভোগ কিছু কিছু ঘটলেও কেবল শান্তিনিকেতনের চৌহদ্দিতে বসে ধ্যান করলেই কি তিনি যা

হয়েছিলেন তার চেয়ে সার্থক হতে পারতেন ? তাঁর রচনা উন্নততর জীবনবোধে অনুস্যূত হত ? অভিজ্ঞতা যত বিচিত্র, অনুভূতি যত তীব্র যত ব্যাপক, লেখার সজীবতা ভাবের বাস্তবতা ততই প্রখর, ততই সত্যস্বরূপ, ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বমুখী। দেশে বিদেশে তিনি যেতেন কেবল বিশ্বভারতীর প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহের জন্য নয়, বিচিত্র তথা সমভাবাপন্ন মানুষের সঙ্গকামনায়। এ সম্বন্ধে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর বইতে রবীন্দ্রনাথের রোমাঁ রোলাঁকে লেখা দুটি চিঠি থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তাতে একথা প্রমাণ হবে।

"Personally I do not think that my overcautious doctor was wise in holding me back (from undertaking a trip to Europe). He does not fully realise how great is the mental strain that my stay in India imposes on one. It is the moral loneliness which is a constant and invisble burden that oppresses me most."

আমি তো ভাবতে পারি না, রবীন্দ্রনাথ যদি জাপান না যেতেন, যদি ন্যাশনালিজম্ গ্রন্থ লেখা না হত তাহলে কি এই রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবী জানত ? যদি চীন না যেতেন, বহুদিন পরে চীনের সঙ্গে এই যোগাযোগ স্থাপন না করতেন, যদি চীনাভবন না হত, যদি চীনের বাস পরিধান করে চীনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঐ সত্য উচ্চারণ করে না যেতেন যে যেখানে ভালবাসা সেখানেই মানুষের নবজন্ম— তাহলে কী করে আমরা বিশ্বকবিকে পেতাম ? রবীন্দ্রনাথের মনে জাতিধর্মের গণ্ডিছেঁড়া মানব-ঐক্যের বোধ একটি চিরসত্য—গোরাতেও আমরা তা পেয়েছি। কিন্তু যেসব সত্য আমরা নির্ভুলভাবে জানি, বার বার আমাদের তারও প্রমাণের দরকার হয়। এবং যতবারই প্রমাণ পাই আমাদের অন্তরস্থ সত্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে আলো হাতে অন্যকে পথ দেখায়। যদি কবি নোবেল প্রাইজ না পেতেন, 'রিলিজিয়ান অব ম্যান' লেখা না হত, তাহলে তিনি কী করে আরো ভালো কবি হতেন—কী জানি। যদি পেরুতে নিমন্ত্রণ না পেতেন, যদি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে দেখা না হত, যদি তার জীবনের মাঝখানে হঠাৎ মাধুরীর একটি স্বর্ণরেখা আঁকা না পড়ত, তাতে তাঁর বা আমাদের কী উপকার হত ? যদি পূর্ব-এশিয়ার বন্দরে এশিয়ার মিলনসূত্র খুঁজে না বেড়াতেন, তাতে তাঁর বা আমাদের কী উপকার হত ? তাহলে কি তাঁর শিল্পী-সত্তা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠত ? তাহলে কি ইন্দোনেশিয়ার সেই বীর কমিউনিস্ট নয়োটো মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার পরে তাঁর অন্তিম ঘোষণা রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শেষ করতে পারতেন—"জীর্ণপাতা যাবার বেলায় বারে বারে—ডাক দিয়ে যায় নূতন পাতার দ্বারে দ্বারে ?"

বিভিন্ন দেশে কালে ছড়ানো কত মানুষের মনে রবীন্দ্রবাণী কত বিচিত্র ধ্বনি তুলেছে ; আনন্দ দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, এমনকি দুঃখের মাধুরীতে দিশাহারা করেছে, তা কি সম্ভব হত যদি না তিনি তাঁর চিত্ত-সুধা নিয়ে, মৈত্রীর বাণী নিয়ে, দেশ-দেশান্তরে যেতেন। একে প্রচার কবা বলা যেতে পারে, কিন্তু কেউ যদি কোনো সত্য উপলব্ধি করে, তবে তা প্রচার করা তো তার দায়িত্ব। কারণ, সত্য তা তার একার বস্তু নয়, সে তো বিশ্বের ধন। ধর্মে কর্মে বিচ্ছিন্ন, দ্বন্দ্বক্লিষ্ট একদিকে দুঃখী অন্যদিকে অত্যাচারী মানুষের ভয়ানক দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

যিনি বলেন, এই বাহ্য—অন্তরে মানুষ এক, তিনি একটি সত্যকে পুনরুচ্চারণ করেন। বহু পূর্বে চণ্ডীদাস বললেন, সবার উপরে মানুষ সত্য। একই সত্যকে বার বার নতুন নতুন মানুষ নিজের জীবনে নতুন করে উপলব্ধি করেন এবং তখনই তিনি ঘোষণা করেন শৃণ্বন্তু বিশ্বে—। পরশপাথর পেলে সে মাটির ঢেলাকে সোনা করতে চায়, তাকে প্রশংসার সন্ধানে ঘোরা বলা চলে না। একবারের বিশ্ব-ভ্রমণ সম্বন্ধে কৃপালনিজী লিখছেন "music of human adulation has become sweeter than the music of rains." কবি লেখেন, শান্তিনিকেতনের বর্ষার সংগীত শোনবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল, তবুও বিদেশভ্রমণে গেলেন—সেই কারণে এই মন্তব্য। জীবনীকারের এই কথার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। কারণ, অনেকবার তিনি লিখেছেন, কবি তাঁর এই বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নের জন্য বিদেশে বার বার নিন্দিত হয়েছেন; আবার বলছেন, প্রশংসার লোভেই তাঁর বিদেশে যাওয়া। কোনো মানুষ যদি সৎকর্ম করে, সকল কর্ম করে, যদি তাঁর বাণীতে সত্য থাকে, সৌন্দর্য থাকে, মাধুর্য থাকে—তাহলে তাঁর প্রশংসা হবেই, খ্যাতি হবেই। এর কোনো উপায় নেই। ওকাকুরা একটি মন্ত্র পেলেন—এশিয়া ইজ ওয়ান। সে একেবারে খাঁটি মন্ত্র নয়—তবু তিনি তাঁর প্রচারের জন্য দেশে দেশে বেরিয়ে পড়লেন—সে কখনো প্রশংসা কুড়োবার জন্য নয়।

লেখক কয়েকজন বিদেশীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন যে কবিকে দেখে যে অনেকে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে পড়ত, তা তাদের ভালো লাগেনি। কেউ দেখলেন, দুজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা তাঁর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে, পিছু হটে বেরিয়ে গেলেন; কিংবা কেউ খ্রীষ্টের সঙ্গে সাদৃশ্যে অভিভূত; কেউ বা মনে করছে অতীতের সেই জ্ঞানী পুরুষদের প্রতিচ্ছবি। তাঁকে দেখে কেউ প্রণত হয়েছে, কারও চোখ দিয়ে জল পড়েছে, সে কি তাঁর দোষ? এ কি প্রফেট সাজা? 'গীতাঞ্জলি'র কবিতার ধর্মভাবে যখন ইয়োরোপ মোহিত, তখনই 'ক্ষণিকা'র কবিতার অনুবাদ ছাপাতে তাঁর দ্বিধা হয়েছিল কি? সে তো নিজহাতে প্রফেটের মূর্তি ভেঙে দেওয়া।

সমস্ত বিশ্বের অভিমত অগ্রাহ্য করে নাস্তিক দেশ রাশিয়ায় গেলেন—সে কি প্রশংসার লোভে, না মানুষের ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তনের সাক্ষী হতে? মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায়, মানুষকে জানবার ইচ্ছায় তাঁর এই তীর্থযাত্রা। এ কি তাঁর চিরতরুণ মনের পরিচয় নয়? জীবনের পর্বে পর্বে নতুন নতুন বিবর্তনের পথে রবীন্দ্রজীবনের কত ফসল ফলল, তা কি সম্ভব হত যদি ছাতিমতলায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন? আমি বিস্মিত এই দেখে যে বিদেশের নিন্দাগুলিকে লেখক উল্লেখযোগ্য মনে করেছেন, কিন্তু প্রশংসাগুলিকে উচ্ছ্বাস আর অতিভক্তি বলে তাচ্ছিল্য করেছেন। এর কারণ বোঝা গেল না। বিশেষত অবাঙালী হয়েও যে রকম নিভুর্লভাবে তিনি রবীন্দ্রকাব্য বিচার করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের অন্তরপুরুষের গভীরতর রূপ তাঁর কাছে আরো স্পষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল নাকি? রবীন্দ্রনাথ কেন এই রবীন্দ্রনাথ হলেন, অন্য রবীন্দ্রনাথ হলেন না—তা নিয়ে আক্ষেপ করা নিরর্থক।

দু-চারটি ভুলের মধ্যে একটির উল্লেখ করছি। কবি যখন কালিম্পং যেতেন

তখন সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোনো বাড়ি ছিল না। কবি গৌরীপুরের জমিদারদের কাছ থেকে তাঁদের বাড়িটি চেয়ে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রথীন্দ্রনাথ কালিম্পং-এ একটি বাড়ি করেন (চিত্রভানু)।

যেটুকু সমালোচনা বা প্রতিবাদ করলাম, তা সত্ত্বেও মানতেই হবে, সমগ্র বইটি রবীন্দ্রকাব্যের সুরে এমন করে বাঁধা, ছত্রে ছত্রে তাঁর কবি তার ধ্বনি এমন স্পন্দমান যেন আমরা সেই কবিকেই ধরতে পারি যিনি 'স্তুতিনিন্দার জ্বরে' পরাভূত নন, নিজের গানের কাছে নিজেই পরাজিত। বইটি পড়া শেষ হয়ে গেলে একটা অনির্দিষ্ট কষ্ট মনকে ছুঁয়ে থাকে। যে মানুষ একদিন যত কাছে ছিলেন, আমাদের হাসিখেলায় জড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে যেন কিছুক্ষণের জন্য কাছে পাওয়া গিয়েছিল। শেষ পাতাটি শেষ করলে পরম আকাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্য থেকে দূরে যাবার যে শূন্যতা নিঃশব্দে মনকে আবিষ্ট করে সেইটিই এই বইটির চূড়ান্ত সার্থকতা।

সমালোচনা

রাখী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কানাই সামন্ত সংকলিত ও সম্পাদিত। বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৭। মূল্য তিরিশ টাকা।

বইটি প্রেমের কবিতার সংগ্রহ, স্পষ্টতই বিবাহের উপহারের যোগ্য করে ছাপানো। বইখানি হাতে নিয়ে আমার 'মহুয়া' রচনার দিনগুলি বিস্মৃতির আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। সংকলক লিখেছেন, 'মহুয়া কাব্য রচনার পূর্বে 'রাখী' বা 'বরণডালা' নামকরণে যে বিশেষ সংকল্প গ্রহণ করা হয়……বর্তমান কাব্যসংকলন তারই বহুবিলম্বিত পরিণাম।' অপূর্বকুমার চন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তিরা কবির প্রেমের কবিতার সংকলন করতে চেয়েছিলেন বিবাহের উপহারের জন্য। কিন্তু কবি তার চেয়ে বেশি কিছু দিলেন। নতুন কবিতা প্রতিদিন বিকশিত হতে লাগল। বয়স কম হলেও রোজই একটি দুটি নতুন কবিতা শোনবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হইনি। সেটা সম্ভবত ১৯২৮ সাল, কবি ছিলেন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুল দে-র বাড়িতে, সেই সময়ে আর্ট স্কুলে তাঁর প্রথম ছবির প্রদর্শনী হয়। তখনই শুনেছিলাম কবি বলেছেন, পুরনো কবিতা খোঁজার চেয়ে নতুন লিখে ফেলা ভালো। সকলেই বলছিল, সাতষট্টি বছর বয়সে প্রেমের কবিতা লেখা অভিনব।

ভূমিকায় বলা হয়েছে, "অনিচ্ছায় বহু গান ও কবিতা বর্জন করতে হয়েছে; জনে জনে রুচির বৈচিত্র্য আছে। অতএব যা সংকলন করা গেল তা সর্বাংশে হয়ত সকলের মনোরঞ্জন করবে না।" কথাটা ঠিকই—সমস্ত প্রেমের কবিতা ও গানের সংগ্রহ তো একটি গ্রন্থে ধরানো যায় না। কিন্তু যেগুলি সংগৃহীত হয়েছে অন্তত সেগুলি সবই যদি প্রেমের কবিতা হত এবং তার মধ্যেও ঈষৎ আড়ালে যেগুলি আছে সেগুলি সামনে আসত তাহলে কিছুটা নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথের বহুপঠিত বহু-উচ্চারিত রচনাগুলিই সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু অপেক্ষাকৃত আড়ালে আছে অথচ সামনে আসার যোগ্য এমন কবিতাগুলি দেখতে পেলে সুখী হতাম। যেমন 'চিত্রাঙ্গদা'র পরিবর্তে যদি 'সতী' নাটিকাটি থেকে

কিছুটা অংশ, এমনকি হয়তো সমগ্রটাই ঐ কয়েক পৃষ্ঠায় ধরে যেত, এখানে পাঠকরা পেতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রেমের শাশ্বত রূপের পরিচয় তাঁদের লাভ হত। কৈলাসনাথ কাটজু একবার আমায় বলেছিলেন তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক পঁচানব্বই বার দেখেছেন, তাও পঁচিশ বছর আগে, আর আজ তো রেকর্ড হয়ে ঘরে ঘরে বাজছে। এদিকে আমার যতদূর ধারণা 'সতী' নাটিকাটি রবীন্দ্রকাব্যামোদীদের মধ্যেও অন্তত আশি ভাগ পাঠক পড়েননি। নির্বাচনের সময় এইদিকে লক্ষ্য রাখলে ভালো হত।

খুশী হয়েছিলাম অপেক্ষাকৃত অপরিচিত 'বিচিত্রিতা'য় প্রকাশিত 'কুমার' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে দেখে। কিন্তু পড়তে গিয়ে চমকে গেলাম। দ্বিতীয় স্তবকটি বাদ গেছে। কবিতাটি দীর্ঘ, দু-একটি অংশ বাদ দেওয়া চলত, তাতে অর্থের ব্যত্যয় হত না; যেমন চতুর্থ বা পঞ্চম স্তবকের যে কোনো একটি বর্জন করলে অর্থবোধের অসুবিধা হবে না। 'মহুয়া'র প্রথম কবিতাটিতে অতনুর উজ্জীবন আছে—'হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু'। এই বীর কে? সে হচ্ছে আদর্শ পুরুষ যাকে নারী কামনা করে, প্রার্থনা করে নানাভাবে। বিচিত্রিতার 'কুমার' কবিতায় তার বর্ণনা আছে—

দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভবে
বারে বারে বীর জাগো ভয়ার্ত ভবে
ভাই বলে তাই নারী করে আহ্বান
তোমারে রমণী পেতে চাহে না সন্তান
প্রিয় বলে গলে করিবে মাল্যদান
আনন্দে গৌরবে।

পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, দৈত্যের হাতে যখন স্বর্গের পরাভব ঘটল তখন মহাদেবের তপোভঙ্গ করার প্রয়োজন হল আদর্শ বীরকে জন্ম দেবার জন্য। মহাদেব আর উমার প্রেমরসে জন্মালেন কুমার কার্তিকেয়। দৈত্যের হাতে স্বর্গের পরাভব তো কেবল পৌরাণিক কাহিনী নয়। এই মানুষের তৈরি সত্য, সুন্দর ও প্রেমের স্বর্গও তো বারবার আক্রান্ত হয়। কুৎসিত এসে তখন সুন্দরের স্বর্গ ভেঙে দেয়। তখন শৌর্যে বীর্যে যে আদর্শ পুরুষ তাকে রক্ষা করেন, উদ্ধার করেন তিনিই তো বীর, তাঁকেই সম্বোধন করে কবি বলেছেন,

গর্জিত তব তর্জনধিক্কারে
লজ্জিত করো কুৎসিত ভীরুতারে
মন্দ্রিত হোক বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির জাগরণী

এই কবিতার নাম 'কুমার'—পুরাণে বর্ণিত বীর কুমার কার্তিকেয়র সঙ্গে তুলনীয়। যে আদর্শ পুরুষ তাকেই নারী প্রার্থনা করে কখনো ভাইরূপে, কখনো পতিরূপে, কখনো পুত্ররূপে।

'কুমার' কবিতাটি বহুপঠিত নয়, তাই এর থেকে আসল পদগুলি বাদ যাওয়া আমার পক্ষে অসহ হয়েছে। এই কবিতাটির নাম কুমার কেন, কুমার কে, কুমার নামের ব্যঞ্জনা কী, কিছুই বোঝা গেল না।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ যখন কোনো সংকলন প্রকাশ করেন তখন ইচ্ছামত কাটছাঁট করবার অধিকার তাদের আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ করা হয়েছে ঐতিহাসিক দলিল রক্ষার খাতিরে। উদাহরণস্বরূপ 'চোখের বালি'র শেষাংশের পুনর্যোজনার কথা বলা যায়। এতে শিল্পের ক্ষতি হয়েছে, কারণ শিল্প তো ইতিহাস নয়।

বর্তমানি সংকলনের ভূমিকাটি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের যে লেখাগুলির গ্রন্থনা করা হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রচিত্তের রসবৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যায়। কবি বুঝতে পারেন না তাঁর মধ্যে "সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল"—অর্থাৎ এই দুটি ভাবই পাশাপাশি মেশামেশি করে আছে। সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিরাগী করে, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ও আসক্তির বন্ধনে ধরা পড়তে চায় না। পূর্ণ যৌবনের রচনা 'কড়ি ও কোমলে'ও আমরা এই নিরাসক্তি দেখতে পাই—

চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।

"রিয়েল ও আইডিয়েলের মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য—" তাই রিয়েল থেকে কবি ক্রমাগত উত্তীর্ণ হচ্ছে আইডিয়ালে—রক্তমাংসের রিয়েল না হলে মানুষের প্রেম রূপ ধারণ করে না কিন্তু সেখানেই তাঁর প্রেমরস জীর্ণ হয়ে যায় না, তা ক্রমাগত উত্তীর্ণ হয়, অধরা নিরুদ্দেশ যাত্রায়—

যে কথা ফুটিয়া ওঠে কুসুমবনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীলগগনে।

শুধু নরনারীর প্রেম বিষয়ে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কবির এই ভাব। বাস্তব অভিজ্ঞতা ক্রমাগতই উত্তীর্ণ হচ্ছে অপার্থিব ভাবের দ্যোতনায়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এগিয়ে চলেছেন বিশ্বভাবনায় বিশ্ববোধে। বাস্তব জীবনে নরনারীর প্রেমকে অগ্রাহ্য করেন না কবি। তিনি সন্ন্যাসী কদাপি নন, যেমন আকাশের তারা ফুলের সুগন্ধ তেমনি মানুষের ভালোবাসাও তাঁর হৃদয়াকাশ ছাপিয়ে মাধুর্য ঝরিয়ে দেয় কিন্তু আসক্তির সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে তিনি তাকে আঁকড়ে ধরেন না, কোনো কিছুই আঁকড়ে ধরা তাঁর স্বভাব নয়; অল্প বয়সে লিখেছিলেন, 'তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি করে কাড়িনে।' আবার বৃদ্ধ বয়সে লিখলেন, 'যাবার সময় হলে যেও সহজেই আবার আসিতে হয় এসো—' অর্থাৎ চিরদিনই তাঁর এই নির্লিপ্ততা প্রেমের মোহন রূপের সঙ্গে অরূপকে মিশিয়ে দিয়েছে, তাই কবির খুব কম কবিতাকেই আমরা কেবল নরনারীর প্রেমের কবিতা বলে চিহ্নিত করতে পারি। প্রেমের কবিতা সংকলন করতে বসে সেজন্য সংকলনকারীকে বড়ই বিপদে পড়তে হয়। কখন যে প্রেম পূজায় উত্তীর্ণ হয়, কখন যে তা বিশ্বসৌন্দর্যে লীন হয়ে 'পাতায় সোনার বরন' আলো হয়ে নাচে প্রকাশকের পক্ষে তা বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু যেহেতু এই বইটি বিশেষভাবে 'প্রেম ও পরিণয়ে'র কবিতাসংকলন এবং বিবাহের উপহারের উপযোগিতাই বিশেষভাবে লক্ষ্য, তাই বুঝতে পারি না যে গানগুলি নিতান্তভাবেই পূজার কিংবা যে কবিতা কোনো গভীর তত্ত্ববাণী বহন করছে, যা রবীন্দ্রজীবন-

দর্শনের প্রতিচ্ছবি, তা কেন এই সংকলনে গ্রথিত হল এবং খুব স্পষ্টতই যা প্রেমের কবিতা বলে বোঝা যায় তা কেনই বা বাদ গেল? 'আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি'—এ গান কি প্রেমের গান? 'তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে আমার করে নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে।'—এ কি কবি কোনো নারীকে বলছেন?

গীতাঞ্জলির কোনো গানকেই নরনারীর প্রেমের কবিতা বলে অভিহিত করা যায় না। আবার কেবল পূজাও তা নয়। বস্তুত তা এক রহস্যঘন মরমীয়া উপলব্ধি যা কবিকে ক্রমাগত সংসারসীমা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে অনির্দেশ্য কোনো ভাব-সমুদ্রের দিকে। অথচ স্পষ্টতই প্রেমের কবিতা—সানাইর 'অসম্ভব'—মনে হচ্ছে সংকলনকারীর চোখেই পড়েনি—

এমনি রাতে কতবার মোর বাহুতে মাথা
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরীগাথা
রিম ঝিম ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে বাঞ্ছিত
এল সেই রাতে বহি শ্রাবণের সে বৈভব
মন শুধু বলে অসম্ভব এ অসম্ভব।

দূরে যৌবনের মিলনস্মৃতি চিরতরুণ কবির মনে বৃদ্ধ বয়সে ফিরে ফিরে আসছে আর মনে হচ্ছে, কী অসম্ভব?

গানের প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রেমের গান কমই সংগৃহীত হয়েছে। ফাল্গুনীর গান 'ও মোর ভালোবাসার ধন, তোমায় নূতন করে পাব বলেই হারাই ক্ষণে ক্ষণ' কি প্রেমিক-প্রেমিকার কথা? এ জীবনমৃত্যুর লীলার কথা। 'প্রাণশক্তিই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে' তাই 'দেখা দেবে বলেই তুমি হও যে অদর্শন' এই 'তুমি' কোনো যৌবনচঞ্চলা নারী নয়। ভালোবাসা শব্দটা আছে বলেই ফাল্গুনীর এই বহুশ্রুত গানটির সমস্ত তাৎপর্য বদলে এভাবে প্রেমের গান বলে চিহ্নিত করা কি নতুন পাঠকদের বিভ্রান্ত করা নয়?

'হৃদয়যমুনা' অবশ্যই প্রেমের কবিতা কিন্তু তাই বলে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'কে কি তা বলা যায়? 'হে সুন্দরী' বলে সম্বোধন আছে বলেই কি ধরে নিতে হবে কোনো তরুণ-তরুণীর নৌকাবিহারের কথা বলা হচ্ছে? আমরা তো জানি, জীবনদেবতা, অন্তর্যামী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, সিন্ধুপারে—এইসব কবিতাই জীবনদেবতা পর্যায়ের অন্তর্গত। এই সময়ে মনে হয় কবি যেন ডিটারমিনেশন-এ বিশ্বাসী। কে তিনি অন্তর্যামী—যিনি অন্তর মাঝে বসি অহরহ মুখ হতে ভাষা কেড়ে নিচ্ছেন? যিনি কৌতুকময়ী আমাদের নিয়ে খেলা করেন তিনি—তখন আমি নিজে যা বলতে চাই—তা আর বলা হয় না 'তুমি যা বলাও আমি বলি তাই।' এ জীবনের নিয়ামক কে? আমি নিজে? না যিনি অন্তর্যামী? তিনিই যেন আমাদের নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে বেরিয়েছেন—প্রতিদিনই প্রত্যূষে এই নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় রাত্রের সুপ্তিতে। তেমনি জীবনপ্রারম্ভে আমরা নিরুদ্দেশ যাত্রা করে বেরিয়েছি—জানি না সামনে কী আছে। কিসের অন্বেষণে আমাদের এই যাত্রা আমরা কি জানি? কী আছে শেষে বা পথের শেষ কোথায়—এই তো প্রশ্ন। আমরা জানি এটা তরী,

চিরকালের আবাস নয় এবং এ সোনার তরী কারণ এই তরী লোভনীয়, আমরা এ জীবনটা ভালোবাসি। তবু আমাদের চির প্রশ্ন এই দিনশেষে কোথায় পৌঁছাব, সেখানে সেই তিমিরতলে আছে কি সুপ্তি আছে কি শান্তি ?' কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো উত্তর মেলে না।

এই তরণীর উপমা শেষ মৃত্যুর গানটিতেও 'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।' তখন আর কোনো প্রশ্ন নেই, কর্ণধারের হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার পরিণাম 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটিতে। তাই কোনোক্রমেই জীবনদেবতা পর্যায়ের কোনো কবিতা অর্থাৎ এই তত্ত্বচিন্তাকে নরনারীর প্রেমানুভূতি বলে চিহ্নিত করা যায় না যদিও সুন্দরী, কৌতুকময়ী, নাথ বলে এসব কবিতায় উদ্দিষ্ট কাউকে সম্বোধন করা হয়েছে।

'রাখী' বইটির ছাপা বাঁধাই সুদৃশ্য, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রসিদ্ধ রেখাঙ্কন বরবধূর লাবণ্যময় মূর্তি আমাদের মনোহরণ করে এবং নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে আজকালকার পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করবার ইচ্ছা কেবল অর্থসংগ্রহের জন্য নয় তাও আমি বিশ্বাস করি ; কিন্তু পাঠক যাতে বিভ্রান্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা ভালো।

কাদম্বরী দেবী—সুব্রত রুদ্র। আশা প্রকাশনী। কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার নানা ব্যাখ্যা আছে। সুব্রত রুদ্র যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, তা হলো, জ্যোতিরিন্দ্র-জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ঘনিষ্ঠতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর ঘনিষ্ঠতা যে ছিল সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, তবে কাদম্বরীর আত্ম-হত্যার কারণ হিসেবে সেই ঘনিষ্ঠতার যে অর্থ দাঁড়ায়, তাতে আমাদের বিচলিত হবার কথা। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত বিচলিত হইনি, কারণ যথেষ্ট কারণ ঘটেনি। এমনি কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর দশম খণ্ডে একটি ছবিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গায়ে হাত দিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও আমরা চমকাইনি। কারণ, ছবিটি খুবই পরিচিত, ওই রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনবধানতার প্রমাণ ওই ছবিটির পরিচয়পত্রটি—জ্ঞান-দানন্দিনীকে ওই পত্রে বলা হয়েছে কাদম্বরী, আর কাদম্বরীকে বলা হয়েছে জ্ঞানদানন্দিনী।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকদের কাছে কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা একটি বড়ো কৌতূহলের কারণ। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কৌতূহলের বিষয়, রবীন্দ্রসাহিত্যে কাদম্বরী দেবীর প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ উল্লেখ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাঠক রবীন্দ্ররচনায় কাদম্বরীর উল্লেখ, স্পষ্ট বা অস্পষ্ট, আবিষ্কার করেছেন। একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলে বোধ হয় বিষয়টির গুরুত্ব গ্রাহ্য হবে।

১ পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নয় : বিদেশী ফুলের গুচ্ছ (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯১), আত্মা (তত্ত্ববোধিনী, শ্রাবণ ১২৯১, অচলিত খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী), বিদায় (ভারতী, চৈত্র ১২৯১), পুষ্পাঞ্জলি (ভারতী, বৈশাখ ১২৯২, গ্রন্থপরিচয় ১৭ খণ্ড, রবীন্দ্ররচনাবলী)।

২ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র : সংখ্যা ১, ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৩

৩ সন্ধ্যাসঙ্গীত : তারকার আত্মহত্যা

৪ প্রভাতসঙ্গীত : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

৫ কড়ি ও কোমল : ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, নূতন, হায় কোথা যাবে, যোগিয়া, পুরাতন শান্তি

৬ বিচিত্র প্রবন্ধ : সরোজিনী-প্রয়াণ, রুদ্ধগৃহ

৭ মানসী : ভুলে, ভুলভাঙা, বিরহানন্দ, ক্ষণিক, মিলন, আত্মসমর্পণ সংশয়ের আবেগ, বিচ্ছেদের শান্তি, তবু, নিভৃত আশ্রম, বিদায়, সন্ধ্যায়, শেষ উপহার, মৌন ভাষা, শূন্য গৃহে, মানসিক অভিসার

৮ চিত্রা : স্নেহস্মৃতি, নববর্ষে, দুঃসময়, মৃত্যুর পরে, ব্যাঘাত

৯ চৈতালি : নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি, বিলয়

১০ ক্ষণিকা : অন্তরতম সমাপ্তি

১১ শিশু : আকুল আহ্বান, পাষাণী

১২ বলাকা : ছবি

১৩ লিপিকা : পায়ে চলার পথ, মেঘলা দিনে, বাণী, মেঘদূত, বাঁশি, সন্ধ্যা ও প্রভাত, পুরানো বাড়ি, গলি, একটি চাউনি, একটি দিন, কৃতঘ্ন শোক, সতেরো বছর, প্রথম শোক, প্রশ্ন

১৪ পূরবী : উৎসবের দিন, গানের সাজি, লীলাসঙ্গিনী, শেষ অর্ঘ্য, বেঠিক পথের পথিক, বকুলবনের পাখি, কিশোর প্রেম, ক্ষণিকা, দোসর, খেলা

১৫ বিচিত্রিতা : নীহারিকা

১৬ বীথিকা : কৈশোরিকা, বিদ্রোহী, গীতচ্ছবি, ছুটির লেখা, নিমন্ত্রণ, ছায়াছবি, নাট্যশেষ, প্রতীক্ষা, বাদলসন্ধ্যা, অভ্যাগত, বাদলরাত্রি

১৭ পত্রপুট : ৫, ১২

১৮ শ্যামলী : বিদায়বরণ, মিলভাঙা

১৯ ছড়ার ছবি : বালক

২০ প্রান্তিক : ১-৭

২১ সেঁজুতি : জন্মদিনে

২২ আকাশপ্রদীপ : জানা অজানা, শ্যামা, কাঁচা আম

২৩ আরোগ্য : ১৩

২৪ ভৌতিক প্রসঙ্গ খাতা :

২৫ জীবনস্মৃতি

২৬ ছেলেবেলা

সমাপ্ত